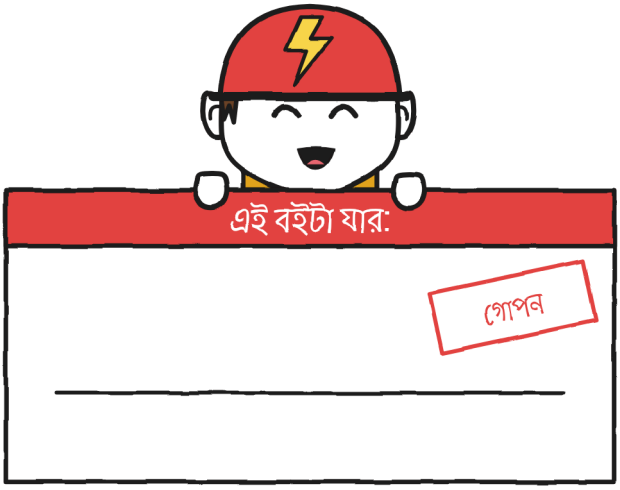

আর আগে আমি পড়ব। -হুঁ.

যদি এটা পাও, ফিরিয়ে দিয়ো। প্লিজ।

শুধু গল্পে

এই সিলমোহর বোঝায়, যা শুধু গল্পে ঘটে: সত্যিকারের পার্সেল উড়ে ফিরে আসে না। সত্যিকারের সাইকেলের বেলায় শেষ পাতাটা দেখো। -হু.

অসম্ভব ডেলিভারি · ৩

ফেরত পাঠান, প্লিজ

LinguAula

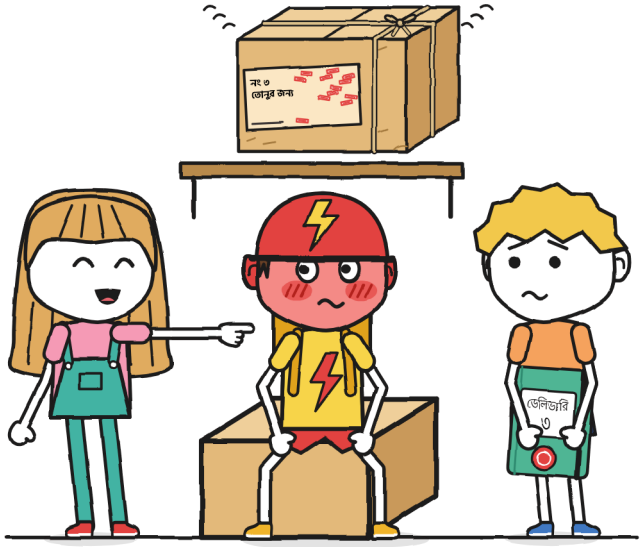

(গুনির খাতা)

সাইজ XL · সচিত্র উপন্যাস · ১৩+

অসম্ভব ডেলিভারি · ৩
ফেরত পাঠান, প্লিজ

সিরিজের তৃতীয় বই। আগের দুটো: “এই পার্সেলটা কামড়ায়” আর “মেঘ ডাকার আগে খুলবেন না”।

লেখা ও ছবি: LinguAula

বাংলা সংস্করণ: LinguAula

সাইজ XL · সচিত্র উপন্যাস · ১৩+

প্রথম সংস্করণ: ২০২৬

© ২০২৬ LinguAula · info@linguaula.com

ক্লাসের জন্য আর বাড়ির জন্য নির্দ্বিধায় ফটোকপি করা যাবে।

ফন্ট: Andika, Patrick Hand, Caveat, Courier Prime, Atma, Galada ও Hind Siliguri (SIL OFL লাইসেন্স)।

linguaula.com-এ প্রতিটা অধ্যায় নিয়ে কাজ করো

এই বই লেখার সময় কোনো ডেলিভারি-কর্মী চোট পায়নি। লাল হয়েছে, হ্যাঁ। -হু.

কে কে

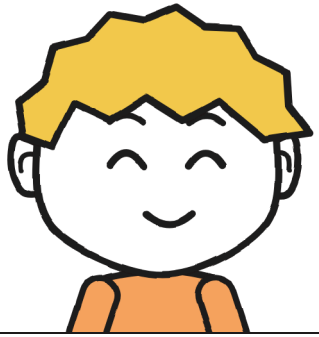

গুনি। শনিবারের ডেলিভারি-বয়। কেউ চায়নি এমন সব জিনিস আঁকে। এই খাতাটা ওর।

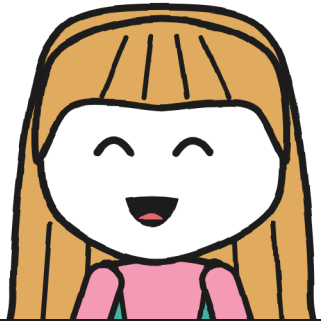

হুলিতা। সবুজ কালিতে লেখে আর "হু." নামে সই করে। কীভাবে সাহায্য করতে হয়, সবসময় জানে। সমস্যাটা সেখানেই।



তোনিও। বিজলির হয়ে সাইকেলে ডেলিভারি দেয়। দশ মিনিটে, নইলে বিনামূল্যে। ভাগে ভাগে লাল হয়।



মায়া। অসম্ভব ডেলিভারির মালিক। মাথায় জাদুকরীর টুপি। যা বলেন, তার চেয়ে বেশি জানেন।

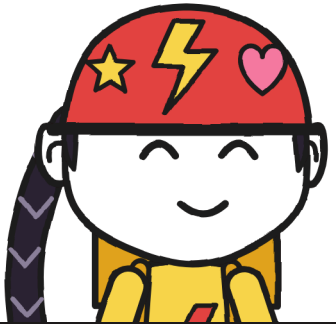

জোয়ি। বিজলির। সবচেয়ে দ্রুত। ডাকনাম দেয়।

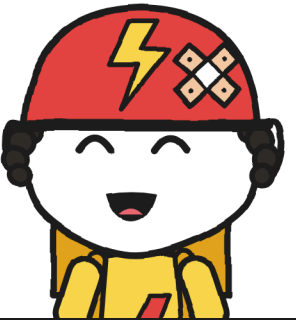

ব্রুনো। বিজলির। একবার পাংচার হয়েছিল। দু-বছর আগে।

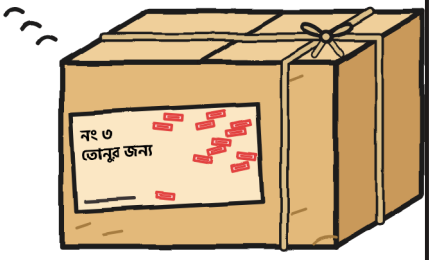

৩ নম্বর পার্সেল। নাড়ালে বাজে। লেবেলে শুধু একটা নাম লেখা।

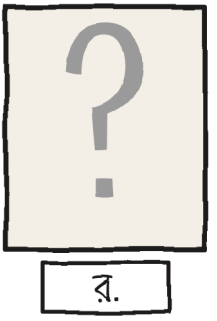

র.। যে পার্সেল কেউ পৌঁছে দিতে পারে না, সেগুলো পাঠান। কেউ ওর নাম বলে না।



অধ্যায় ১

টুংটুং

টুংটুং।

আওয়াজটা ছিল খুব ছোট্ট, সেই ধরনের, যেটা তখনই শোনা যায় যখন আর সবকিছু চুপ করে গেছে: চায়ের কাপে চামচ ঠেকার শব্দ, কিংবা খেলনা সাইকেলের বেল। এল ফেরত পার্সেলের তাক থেকে, আর মারার দোকানে আমরা যে চারজন তখনও ছিলাম, এমন স্থির হয়ে গেলাম যে সিলমোহরের একটা স্ফুলিঙ্গ খসে পড়লেও শোনা যেত।

ঝড় অনেকক্ষণ আগেই চলে গিয়েছিল। হুলিতা তখনও আমার নীল টুলটার ওপর দাঁড়িয়ে, সবুজ মার্কারটা ওপরে তুলে, কাটা ১৯-এর পাশে সদ্য লেখা ১৮ নিয়ে। মারার একটা হাত ঝাঁপ পর্যন্ত যাওয়ার আধখানা পথে থেমে আছে। আর আমি, যে ভালো সময়েও হাত নিয়ে কী করতে হয় জানি না, হাত দিয়ে কিছুই করলাম না।

সেটা ছিল ৩ নম্বর। আর তোনিও, যে বিজলির হয়ে দশ মিনিটে নইলে বিনামূল্যে ডেলিভারি দেয়, নিজের হেলমেটের রঙে রাঙা হয়ে উঠল।

খাতাটা নতুন। ২ নম্বরটা একটাই ঝড়ে ফুরিয়ে গিয়েছিল; এটা সবুজ, এক কোণে দোকানের সিলমোহর, আর প্রথম ব্যবহারটা আমি করতাম রীতিমতো ঘটা করে: প্রথম পাতায় নাম, আর একটা নতুন শব্দ।

ডেলিভারির খাতা ৩ · গুনির। গোপন।

"গোপন" মানে আগে আমি পড়ব। আর কাউকে বলব না। -হু.

জিভ বের করে নামটা লিখলাম, তারপর একটা রাবার আনতে গেলাম, যদি বাঁকা হয়ে গিয়ে থাকে। ফিরে এসে দেখি, প্রথম ব্যবহারটা ততক্ষণে হুলিতা করে ফেলেছে।

"আমি তোমাকে সাহায্য করতে আগে ব্যবহার করে দিলাম," ও বলল। "ধন্যবাদ লাগবে না।"

আমি ওকে সাহায্য করতে বলিনি। হুলিতার বেলায় তাতে কিছু আসে-যায় না।

বাকিটা বলে রাখি, যদি কোনোদিন হুলিতা ছাড়া অন্য কেউ এটা পড়ে। দোকানের নাম অসম্ভব ডেলিভারি, মালিক মারা, যিনি জাদুকরী, মাথায় বেগুনি টুপি, আর তাঁর একটা সিলমোহর আছে, যেটা ছাপ দিলে নিভে যাওয়া মোমবাতির গন্ধওয়ালা স্ফুলিঙ্গ ছিটকে ওঠে। বাঁ দিকের তাকে তিনি ফেরত পার্সেল রাখেন: এমন পার্সেল, যেগুলো কেউ পৌঁছে দিতে পারেনি। ওগুলোর নিয়ম একটাই: যে নেয়, সে যদি লেবেলে না-মোছা কালিতে সই না করে, ভোর হলে পার্সেলটা উড়ে নিজের তাকে ফিরে যায়, রাতের খাবারের সময় বেড়াল যেমন ঠিক সময়ে হাজির হয়। ছিল কুড়িটা, আর সবগুলো পাঠান একই মানুষ, র., যাঁর সম্পর্কে নীল খাতায় আমার ছয়টা সূত্র আছে। হুলিতা আর আমি দুটো পৌঁছে দিয়েছি, একটা ড্রাগনের ডিম আর কিছু ছুটে বেড়ানো বীজ, আর দেওয়ালে ওর হাতের লেখায়, সবুজে, লেখা: বাকি ১৮।

হুলিতা হলো সবুজ নোটগুলোর মানুষ। আমি গুনি, পাড়ার নতুন ছেলে: আমার প্রায় সবকিছু এখনও বাক্সে। আর তোনিও হলো বিজলির ডেলিভারি-বয়, হলুদ ব্যাগ পিঠে ছেলেটা, যে শনিবার শনিবার আমাদের সঙ্গে শাস্তি খাটে আর ঝড়ের পর থেকে দোকানে যার নিজের জায়গা আছে: টুলগুলোর পাশে উপুড় করা একটা ডেলিভারি-বাক্স। মারা ওটা কোনো ব্যাখ্যা না দিয়েই ওকে দিয়েছেন। "আপাতত," বলেছিলেন। একটা আপাতত কতদিন চলে, সেটা জিজ্ঞেস করার সাহস কারও হয়নি।

৩ নম্বরটা ওপরের তাকে, ডিম আর বীজ যে দুটো ফাঁক রেখে গিয়েছিল তার পাশে, লেবেল সামনের দিকে করে। পড়ার জন্য আমি এগোলাম, দাঁড়িয়ে, না ছুঁয়ে।



টাইপ করা তিন লাইন: নং ৩। তোনুর জন্য। আর একেবারে নিচে, প্রেরক: র.। নাম আর শেষ লাইনের মাঝখানে আস্ত একটা ফাঁকা কাগজের মাঠ। চারপাশে বারোটা "ফেরত" সিলমোহর। আমি গুনলাম।

হুলিতা এক লাফে টুল থেকে নেমে আমার পাশে এসে দাঁড়াল। জোরে পড়ল:

"তো..."

আর মুখ বন্ধ করে ফেলল।

হুলিতা কখনও কথার মাঝখানে থামে না। তোনিওর দিকে তাকিয়ে আমি বুঝলাম কেন।

অর্ধেক পড়লাম। বাকি অর্ধেক গিলে ফেললাম। -হু.

কেউ কেউ হঠাৎ পুরো লাল হয়ে যায়। তোনিও না: তোনিও লাল হয় ভাগে ভাগে। শুরু হলো কান দিয়ে। তারপর গাল। তারপর পুরো মুখ ভরে গেল, হেলমেটের ফিতে পর্যন্ত, আর একটা শেষ ধাপ তখনও বাকি, সবচেয়ে খারাপটা, যখন মুখ আর হেলমেটকে আলাদা করা যায় না। ২ নম্বরের কাঁপুনি-মিটারের পর থেকে যা কিছু

বদলায়, তার জন্য একটা মাপকাঠি না বানিয়ে আমি আর তাকাতে পারি না, তাই টুকে রাখলাম।



লেবেলের বাকি অংশটা পড়তে হুলিতা পার্সেলের দিকে হাত বাড়াল।

“ওই পার্সেলটা অপেক্ষা করতে পারে,” তোনিও খুব তাড়াতাড়ি বলল। “ও তো বছরের পর বছর অপেক্ষা করছে, তাই না? আরও একদিন করুক। কিংবা দশদিন। বিজলির কোনো তাড়া নেই।”

বিজলির মুখে এমন কথা আমি এই প্রথম শুনলাম।

“আজ রাতে কিছু খোলা হবে না,” মারা বললেন। “আর অনুমতি ছাড়া তাকে হাত দেওয়া চলবে না।”

হুলিতার হাত লেবেল থেকে এক আঙুল দূরে বাতাসে আটকে রইল। কেউ কিছু ছুঁল না। আর তখনই আবার বেজে উঠল।

টুংটুং।

“ওটা দরজা!” হুলিতা বলল, এমন গলায়, যেমনটা আমি ওর কখনও শুনিনি: বেশি চড়া, আর বেশি তাড়াতাড়ি।

ভেরা চলে যাওয়ার পর থেকে দরজা বন্ধই ছিল।

কিছু না বুঝলে আমি একটা তালিকা বানাই। টুংটুংয়ের সন্দেহভাজন:

১. দরজা। (হুলিতার প্রস্তাব। বন্ধ, হাওয়া নেই, ঠেলার কেউ নেই।)
২. ফুটপাতে তোনিওর সাইকেল, বিজলির বেল সমেত। (বাজে ক্রিং, টুংটুং নয়। তবু বেল তো।)
৩. রবারের ব্যাঙ। (হুলিতা সঙ্গে সঙ্গে ওকে নির্দোষ ঘোষণা করল। বলল, ওকে ও চেনে।)
৪. ৩ নম্বর।

৩ নম্বরকে সবার শেষে রাখলাম, ভদ্রতা করে।



পরীক্ষা করতে ফুটপাতে বেরোলাম। যাওয়ার পথে ব্যাঙটাকে নিয়ে নিলাম, কারণ সন্দেহভাজনকে দূর থেকে জেরা করা যায় না।

বৃষ্টি তখন আর পড়ছিল না। রাস্তায় ভেজা পিচের গন্ধ, আর প্রতিটা জলের ডোবার ভেতরে একটা করে রাস্তার বাতি। দরজা খুললাম আর বন্ধ করলাম: ক্যাঁ-আ-আ-চ। তোনিওর সাইকেলের বেল বাজালাম: ক্রিং! ব্যাঙটা টিপলাম: পিঁক।

কাচের ওপারে হুলিতা আঙুল নেড়ে আমাকে “না” বলছিল। প্রতিটা আওয়াজে একই কাণ্ড, এদিক থেকে ওদিকে, গাড়ির ওয়াইপারের মতো। কোনোটাই নয়।

আমি আবার ঢুকলাম আর ব্যাঙটাকে কাউন্টারে রাখলাম। আমাকে তাকাতে দেখে তোনিও নিজের বাক্সে নড়েচড়ে বসল।

টুংটুং।

আমি নিচু হলাম। তোনিওর বাক্সটা তাকের পায়ার গায়ে ঠেকে ছিল।

ওখানেই, হাঁটু গেড়ে, আমি এঁকে ফেললাম, আর বেরোল একটা বৃত্ত, কারণ যতই ঘোরাই, কোথা থেকে শুরু বুঝে উঠতে পারছিলাম না।

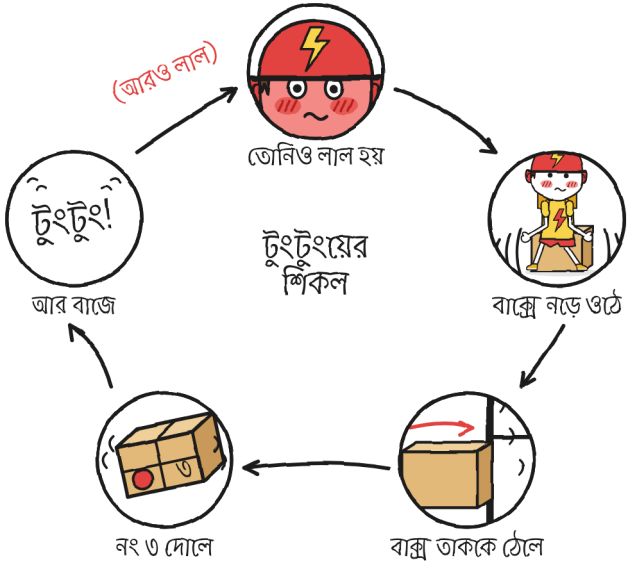

ওটা জাদু নয়। ওটা তোনিও। ৩ নম্বর পার্সেলের ভেতরে এমন কিছু আছে, যেটা নাড়ালে বাজে।

আমার মতো। -হু.

তোনিও আমার দৃষ্টি অনুসরণ করে তাকের পায়া পর্যন্ত গেল, নিজের বাক্সের দিকে তাকাল, আর ঠিক করল, একদম স্থির বসে থাকবে।

টেনে ধরা রবার যতক্ষণ টেকে, ওর স্থির থাকা ততক্ষণই টিকল।

স্থির। তারপর আরও স্থির: এত স্থির যে ও মনে মনে "স্থির" ভাবছে, সেটাও যেন শোনা যাচ্ছিল, কপাল বেয়ে এক ফোঁটা ঘাম গড়াচ্ছে। হুলিতা এক মিনিটেরও বেশি

কথা বলেনি, যেটা ওর পক্ষে জলের নিচে দম বন্ধ করে থাকার মতো, আর দেরিতে হোক বা আগে, দম ফুরোলে মানুষ ভেসে ওঠে মুখের সবচেয়ে কাছে যা আছে তাই নিয়ে।

"তোনু কে?"

তোনিও লাফিয়ে উঠল। বাক্স পায়ায় ধাক্কা দিল, তাক কেঁপে উঠল, আর ৩ নম্বর বলে উঠল "টুংটুং!", এমন জোরে, যেমনটা কোনো টুংটুংয়ের পাওয়া উচিত নয়। মারা ছাদের দিকে তাকালেন, যেমন কেউ তিন পর্যন্ত গোনে।

"শুধু একটা প্রশ্ন ছিল," হুলিতা বলল। "প্রশ্ন তাক ঠেলে না।"

এটা কিন্তু ঠেলে।



"ওটা আমি ছিলাম," তোনিও নিজের জুতোর দিকে তাকিয়ে বলল। "ছোটবেলায়।"

এত আস্তে বলল যে ব্যাঙটা, যেটা কাউন্টারে আমার চেয়ে ওর কাছে ছিল, আমার চেয়ে ভালো শুনল।

হুলিতা মুখ খুলল। আমি ওর প্রশ্নগুলোকে লাইন দিয়ে দাঁড়াতে দেখলাম, রবিবার সকালে রুটির দোকানের লাইনের মতো, প্রথমটা আগে থেকেই হাতে টাকা নিয়ে। তারপর ও তোনিওর দিকে তাকাল, যে তখনও নিজের জুতোর দিকে তাকিয়ে, আর মুখ বন্ধ করল।

"আর কিছু জিজ্ঞেস করছি না," সে বলল।

ওর পক্ষে কঠিন ছিল। পায়ের নড়াচড়ায় সেটা বোঝা গেল: ঠক, ঠক, ঠক, দোকানের মেঝেতে।

যে প্রশ্নগুলো করিনি: নয়টা। লিখে রেখেছি। -হু.

"তাহলে ওটা কখনও পৌঁছে দেননি কেন?" আমি মারাকে জিজ্ঞেস করলাম।

“বারোবার নিয়ে গেছি।” কাউকে সিলমোহর গুনতে বলার দরকার হলো না। “লেবেলটা দেখো: না রাস্তা, না বাড়ির নম্বর, না পদবি। যত তোনু পেয়েছি, সবার কাছে চেষ্টা করেছি।”

উনি মুখস্থ গুনে গেলেন, আঙুলে, আর আমি শুনতে শুনতে এঁকে চললাম। একটা ক্যানারি, সত্যিই যার নাম তোনু, আর যে লেবেলের ওপর পা দিয়েছিল: চলবে না। দন আন্তোনিও, ৭১ বছর, যিনি চশমা পরে কাগজটা দু-বার পড়ে বললেন “আমার তো ইচ্ছেই আছে,” শো-কেসের দিকে যেমন তাকায়, তেমন করে ওটার দিকে তাকিয়ে। খালের একটা নৌকা, গায়ে নাম আঁকা, সেটাও সই করল না, কারণ ওর হাত নেই।

মারার তোনুরা

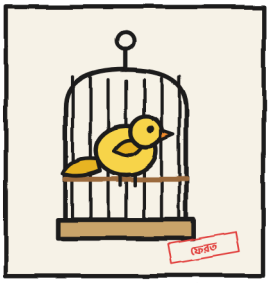

১. একটা ক্যানারি।
(লেবেলের ওপর পা দিয়েছিল। চলবে না।)



২. দন আন্তোনিও, ৭১ বছর।
(“আমার তো ইচ্ছেই আছে।”)

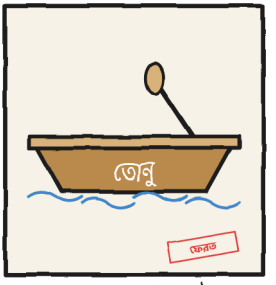

৩. খালের একটা নৌকা।
(ওর হাত নেই।)

“আর তোনিও?” হুলিতা জিজ্ঞেস করল।

“শেষবার যখন চেষ্টা করেছিলাম, তখনও ওকে চিনতাম না,” মারা বললেন, আর ওর দিকে তাকালেন। “আর ছোটবেলায় ওকে কী নামে ডাকা হতো, সেটা কেউ আমাকে বলেনি।”

মারা কাউন্টারের নিচ থেকে একটা বেগুনি কাপড় বের করে ৩ নম্বরটা ঢেকে দিলেন, যেমন করে ঘুমোনোর জন্য টিয়ার খাঁচা ঢাকা হয়। তারপর তোনিওকে একটু উঠে দাঁড়াতে বললেন, আর ওর বাক্সটা তাক থেকে দুই বিঘত সরিয়ে দিলেন।

“এই তো। এবার যত খুশি নড়তে পারো।”

তোনিও চলে যেতে পারত। সাইকেল দরজার কাছেই ছিল: দশ মিনিটে পাড়ার অন্য মাথায় পৌঁছে যেত। ও আবার বসে পড়ল।

কেন, জানি না। তবু লিখে রাখছি।

আর ওর বাক্সে পিঠের ঠেস নেই বলে আমি একটা এঁকে দিলাম: উঁচু, একটু বাঁকা, ছোট্ট একটা কুশন সমেত, পেনসিলে আর ডটেড লাইনে, আর নিচে ছোট অক্ষরে: "পিঠের ঠেস (আমার আইডিয়া)।"

কেউ তোমার কাছে পিঠের ঠেস চায়নি। -হু.



দোকান বন্ধ করার সময় তোনিও সবার শেষে থেকে গেল, হেলমেটের ফিতে আঁটছিল, এত ধীরে যে বিজলিতে সেটা গুরুতর অপরাধ হতো। মারা একটা একটা করে আলো নেভাচ্ছিলেন; বেগুনি কাপড়টা তখনও পার্সেলের ওপর, ওপরের তাকে।

"মারা। কাল আমি ওই নিয়ে কথা বলতে আসব। কিন্তু একান্তে।"

"এই দুজন দোকানেরই লোক," মারা বললেন, না ঘুরেই।

তোনিও আমাদের দিকে তাকাল। প্রথমে হুলিতার দিকে; তারপর আমার। আমি টুলে সোজা হয়ে বসলাম।

"এদের ঠিক আছে," ও বলল। "কিন্তু বিজলির কেউ নয়।"

ও বেরিয়ে গেল, সাইকেল হাতে ঠেলে, জলের ডোবার মাঝ দিয়ে দূরে মিলিয়ে গেল।

টুংটুংয়ের এখন মালিক ছিল। জানা বাকি, মালিক ওটা চায় কি না।

ওকে কীভাবে সাহায্য করতে হবে, আমি জানি। -হু.

আমার ভয়টা সেটাই।



অধ্যায় ২

আমি হ্যাঁ বলিনি

রবিবার দোকান খোলে না। সেই রবিবার মারা ঝাঁপটা অর্ধেক তুলে রাখলেন, ঠিক যতটুকুতে মাথা নিচু করে ঢোকা যায়, আর তাতে হাতে লেখা একটা নোটিশ ঝোলালেন:

বন্ধ (তোমার জন্য ছাড়া)।

তোনিও এল এগারোটায়। ঢোকার আগে রাস্তার এদিক-ওদিক তাকাল, যেমন রাস্তা পার হওয়ার আগে তাকায়। বিজলির কেউ আসছিল না। ব্যাগটা বুকের সঙ্গে চেপে, যাতে ঘষা না লাগে, ও ঝাঁপের নিচে মাথা নিচু করে ঢুকল, আর দোকান ওকে নিঃশব্দে গিলে নিল।

আমরা এসেছি সাড়ে দশটায়। যদি কিছু হয়, তাই। -হু.

নোটিশটা আমি দু-বার পড়েছিলাম। কোথাও লেখা ছিল না "আর হুলিতা", কিংবা "আর গুনি"। কিন্তু মারা কিছু না বলে আমাদের জন্য দরজা খুলে দিলেন, বাঁ ভুরুটা ওপরে তুলে, আর ভেতরে ঢুকতে দিলেন।

আমরা টুলে বসলাম, এমন মুখ করে, যেন কিছুরই অপেক্ষায় নেই। ওই মুখটা আমার চেয়ে খারাপ আর কারও হয় না।

মারা ৩ নম্বরটা কাউন্টারে রাখলেন আর কাপড়টা সরিয়ে নিলেন।

“তিন নম্বর পার্সেল। তোনুর জন্য। তুমিই কি?”

“ছিলাম।”

“আমার চলবে। ওটা কি তুমি চাও?”

তোনিও বাক্সটার দিকে তাকাল। বাক্স কিছু বলল না।

“আমি হ্যাঁ বলিনি।”

“না-ও তো বলোনি।”

“আমি বলেছি যে আমি হ্যাঁ বলিনি।”

আমি থাকতে পারব বলে কতবার যে হ্যাঁ বলেছি। তোনিও কিন্তু হ্যাঁ না বলেই ওখানে বসে ছিল। আমি টুলের কিনারা আঁকড়ে ধরলাম।

“তিনটে বাক্য,” হুলিতা ফিসফিস করল। “আর কোনোটাই হ্যাঁ নয়। আমি গুনেছি।”

মারা জোর করলেন না।

তোনিও বাক্সটা ধরল, যেমন করে গরম সসপ্যান ধরে: দু-হাতে, আর ছেড়ে দিতে পারলে বাঁচে। ওজন দেখল। ঘোরাল। কানের কাছে নিয়ে একটু নাড়ল।

টুংটুং।

তাড়াতাড়ি ছেড়ে দিয়ে নিজের হাতের দিকে তাকিয়ে রইল।

“ও যদি ওটা বাড়ি নিয়ে যায়?” হুলিতা বলল। “পার্সেল যদি যে নিয়েছে তার বাড়িতে রাত কাটায়, তাহলে তো পৌঁছেই গেল। এটা যুক্তির কথা।”

“ফিরে যাওয়ার সিলমোহর যুক্তি মানে না,” মারা বললেন। “ওটা চলে কালিতে।”

“সিলমোহরের সঙ্গে আমার মত মেলে না,” হুলিতা বিড়বিড় করল, যেটা ওর মুখে আত্মসমর্পণের সবচেয়ে কাছাকাছি কিছু, যা আমি শুনেছি।

ব্যাপারটা পরিষ্কার করতে আমি একটা ছক বানালাম। নাম: পৌঁছানো ধরা হবে?

- তাকানো: না।
- ধরা: না।
- বাড়ি নিয়ে যাওয়া: না।
- লেবেলে না-মোছা কালিতে সই করা: হ্যাঁ।

"এই ডেলিভারিটা তোমাদের," মারা হুলিতা আর আমাকে বললেন, "মেঘের ডাকের ডেলিভারির মতোই। তিনটে শর্তে।"

আঙুলে গুনে গুনে বললেন:

১. তোমরা বাক্স খুলবে না। আর লেবেল আটকানোই থাকবে।
২. ৩ নম্বর দোকান থেকে বেরোবে শুধু তখনই, যখন তোনিও চাইবে।
৩. সই করে সে-ই, যে নেয়, যদি সে চায়। সই না করলে ভোর হলে পার্সেল ফিরে আসবে, আর এখানে কিছুই হয়নি।

হুলিতা ক্লাসের মতো হাত তুলল।

"আর যদি কখনওই না চায়?"

"তাহলে কখনওই না।"

"কখনও" কোনো ডেলিভারির সময়সীমা নয়। -হু.

তোনিও অনেকক্ষণ চুপ করে রইল। হুলিতা ঘড়ি ধরে মাপল: চার মিনিট। বিজলির হিসেবে প্রায় আধখানা ডেলিভারি। ওই চার মিনিটে ও পার্সেলের দিকে তাকাল, দরজার দিকে তাকাল, নিজের হাতের দিকে তাকাল। শুধু আমাদের দিকে তাকাল না, আর সেজন্য আমি কৃতজ্ঞ ছিলাম।

"আমি এটা নিয়ে যাচ্ছি," শেষে ও বলল। "বন্ধ অবস্থায়। ভাবার জন্য। আপাতত।"

"তুমি কি চাইছ?" মারা জিজ্ঞেস করলেন।

“আমিই চাইছি।”

যাতে কেউ অন্য কিছু বলতে না পারে, আমি একটা বেরোনোর কার্ড বানালাম:

- বাক্স: বন্ধ। হ্যাঁ।
- লেবেল: আটকানো। হ্যাঁ।
- চাইছে: তোনিও। হ্যাঁ।
- সই: এখনও না।

বাইরে রোদ উঠেছিল, রবিবারের ঝড়ের পরের সেই রোদ, যা সবকিছু সদ্য ধোয়ামোছা করে রেখে যায়। তোনিও ৩ নম্বরটা সাইকেলের ঝুড়িতে রাখল, আর ছাড়তেই বেজে উঠল: টুংটুং।

ও হ্যান্ডেলের দিকে তাকিয়ে রইল, যেখানে বিজলির বেল লাগানো, ধূসর আর গোল।

“কী?” হুলিতা জিজ্ঞেস করল।

“কিছু না।”

আর ও হেঁটে চলে গেল, সাইকেল হাতে ধরে। তোনিও প্রায় কখনও হেঁটে যায় না।

ওই “কিছু না” আসলে “কিছু একটা” ছিল। ওকে সাহায্য করতে হবে। -হু.

দরজা থেকে আমি দেখলাম মোড়ে বিজলির দুটো সাইকেল দাঁড়িয়ে, হলুদ ব্যাগ সমেত: কোমর পর্যন্ত বেণীওয়ালা একটা মেয়ে, আর তার পাশে, বিশাল একজন।

“তোনিও! ঝুড়িতে কী নিয়ে যাচ্ছ?” চেঁচিয়ে বলল বেণীওয়ালা মেয়েটা।

“একটা ডেলিভারি।”

“কার জন্য?”

“এক গ্রাহকের জন্য।”

ও মিথ্যে বলল না। কিন্তু উত্তর দেওয়ার আগে ঝুড়িতে বাক্সটা আস্তে ঘুরিয়ে দিল, যাতে লেবেলটা ওর দিকে থাকে।



“বিজলির কেউ নয়” মানে কী, বুঝলাম।



সেই রাতে আমি ঘরের জানালার খড়খড়ি তুলে রাখলাম। আমি দোকানের উল্টোদিকে থাকি: ৩ নম্বর ফিরলে আমিই দেখব। জানালার সামনে দুটো চেয়ার রাখলাম, একটা আমার, আর একটা, ছোট্ট, অ্যালার্ম ঘড়ির জন্য। দোকানের দরজার ওপরের ছোট্ট জানালাটা, যেটা মারা এই জন্যই খোলা রাখেন (প্রথম দিন আমি ওটাকে চিঠির বাক্স ভেবেছিলাম), ছিল একটা কালো, স্থির আয়তক্ষেত্র।

“গুনি?” আমার মা করিডোর থেকে বলল। “জেগে আছ কেন?”

“একটা পার্সেলের ওপর নজর রাখছি।”

“ও। আচ্ছা। তবে রাতের পোশাক পরে নজর রাখো।”

প্রথম কুড়ি মিনিট আমি ছোট্ট জানালাটার দিকে তাকিয়ে রইলাম; পরের সময়টা অ্যালার্ম ঘড়ির দিকে; বাকি রাত খাতার দিকে, কারণ অপেক্ষা করার সময় আমার হাত নিয়ে কিছু একটা করার দরকার হয়। তাই জানালার তাকে, রাস্তার বাতির আলোয়, আমি তোনিওর আসনটা আরও ভালো করলাম। ভার্সন ১ ছিল শনিবারের পিঠের ঠেস; ভার্সন ২-এ আছে হাত রাখার ঠেস আর গ্লাসের জন্য একটা গোল গর্ত। গ্লাসটাও এঁকেছি, ন্যাপকিন সমেত।

হুলিতাও নজর রাখতে চেয়েছিল, কিন্তু ওর জানালা উঠোনের দিকে, আর উঠোন থেকে একমাত্র যা নজর রাখা যায়, তা হলো শুকোতে দেওয়া কাপড়।

ভোরে আগে শোনা গেল, তারপর দেখা গেল।

টুংটুং, টুংটুং, টুংটুং।

ছাদের ওপর দিয়ে আসছিল, কোনো তাড়া ছাড়াই, আইসক্রিমের গাড়ি যখন এখনও মোড় বেছে নেয়নি, তখন যেমন বাজে তেমন বাজতে বাজতে। একটা জানালায় আলো জ্বলল, তারপর আরেকটা, তারপর আরেকটা: তিনটে, যেন কেউ হাজিরা ডাকছে। একটা কুকুর ডাকল, চার নম্বরের কুকুরটা, যে যা-কিছু ওড়ে তাকেই দেখে ডাকে, পার্সেল হোক বা পায়রা। আর তখন আমি দেখলাম: ছোট্ট, চৌকো একটা পিণ্ড, পেছনে গোলাপি আকাশ, আমার জানালার উচ্চতায় আমার রাস্তা পেরোল, দরজার ওপরের ছোট্ট জানালা দিয়ে ঢুকে পড়ল, আর ভেতরে গিয়ে নিজের তাকে নামার সময় শেষ একটা টুংটুং শুনলাম, আরও ছোট, যেমন কেউ টেবিলে চাবি রাখলে হয়।

“ওটা কি ওই?” মা করিডোর থেকে জিজ্ঞেস করল, এমন গলায়, যে এখনও পুরোপুরি ঘুমোয়নি।

“হ্যাঁ, ওটাই।”

“তাহলে এবার জলখাবার।”

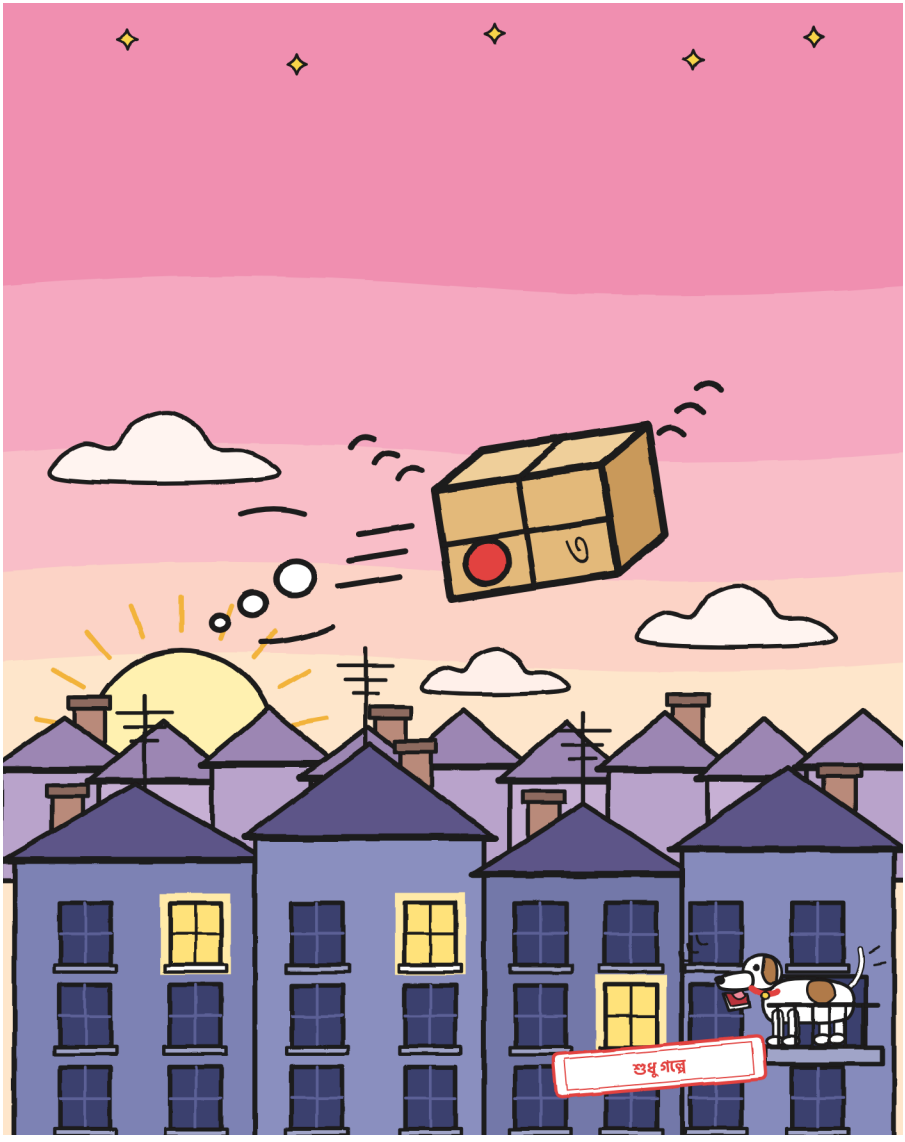

আমি আরেকটু জানালার ধারে থাকলাম। মা আবার ডাকলে জলখাবার খেতে গেলাম।

স্কুলের পর আমরা দোকানে গেলাম। ৩ নম্বর নিজের তাকেই ছিল, আর ওতে একটা সিলমোহর বেশি, লাল, কালি তখনও ভেজা, যেটা কেউ ছাপেনি: তেরো।

আমি বললাম, ওটাকে আবার তাকে দেখে আমার কষ্ট হচ্ছে।

“এটা শাস্তি নয়,” মারা বললেন। “এটাই নিয়ম। কেউ সই করেনি: তাই ফিরে আসে।”

তেরোটা সিলমোহর। এই হারে বাক্সটাই আর দেখা যাবে না। -হু.

তোনিও এল পাঁচটা কুড়িতে, নিজের ডেলিভারির পর। ও ফিরে এসেছে কি না জিজ্ঞেস করল না: নিজের বাড়ির ওপর দিয়ে ওটাকে উড়ে যেতে শুনেছিল। ও নিজের বাক্সে বসল, যেটা তখনও তাক থেকে দুই বিঘত দূরে, আর পার্সেলের দিকে না তাকিয়েই তাকাল, যেমন মানুষ তাকায় এমন কারও দিকে, যে তার দিকে তাকিয়ে আছে বলে সে জানে।

এটা আমি দেখিনি। ও নিজেই আমাকে বলেছিল:

তোনিও আমাকে যা বলল



“ওটা আমি পাপোশে রেখেছিলাম। সারা রাত।”

“ঘরে আনলে না কেন?” হুলিতা জিজ্ঞেস করল।

“আমাকে ওই নামে ডাকার লোক বাড়িতে এমনিতেই অনেক।”

রাগ না করে বলল, সমতল গলায়, যেমন করে ঠিকানা বলে। হুলিতা জিজ্ঞেস করল না "অনেক" মানে কতজন। ওর পা একবারই বলল: ঠক।



"একটা সই করলেই সব ঠিক হয়ে যেত," তোনিও চলে যেতেই হুলিতা বলল। "মাত্র একটা। দুই সেকেন্ড লাগে। নিজেরটা দিয়ে আমি মেপে দেখেছি।"

সত্যিই। আলাদা একটা কাগজে তিনবার করে দেখাল, ওর চিরকালের হু. দিয়ে: দুই সেকেন্ড, দুই সেকেন্ড, আর যেবার বাঁকা হলো, আড়াই সেকেন্ড।

আমি খাতা খুললাম আর কলম দিয়ে চেপে চেপে লিখলাম, যাতে সবুজ রং ওটাকে ঢেকে দিতে না পারে:

ও বলেনি যে আমরা ওর হয়ে এটা মিটিয়ে দিই।

এত জোরে চাপলাম যে বাক্যটা পরের পাতাতেও ফুটে উঠল, উঁচু হয়ে। হুলিতা সবুজ মার্কার বের করল। দাগ দিয়ে চেষ্টা করল, প্যাঁচ দিয়ে, ক্রস দিয়ে, ঢেউয়ের মেঘ দিয়ে। সবুজ মোছে না, কিন্তু ওই বাক্যটাকে ঢাকতে পারল না: ওটা নিচে থেকেই গেল, পুরোটা, ওর গভীর টানগুলো সমেত, কাগজে গেঁথে।

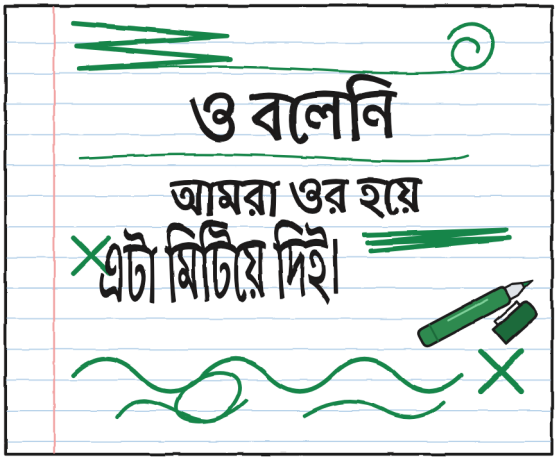

পড়েছি। আমি একমত নই। আপাতত। -হু.

আমি ওর দিকে তাকালাম।

আমার আরেকটা আইডিয়া আছে। অমন করে তাকিয়ো না। -হু.



অধ্যায় ৩

অটোগ্রাফ

মঙ্গলবার স্কুল থেকে বেরিয়ে দেখি, দোকানের সামনের ফুটপাতে একটা টেবিল। টেবিলেরা নিজে নিজে রাস্তায় বেরোয় না, আর এটা আবার সেজেগুজে এসেছে: মাটি পর্যন্ত নেমে আসা হলুদ টেবিলক্লথ, হুলিতার হাতের লেখায় একটা পোস্টার, আর মাঝখানে একটা ঢাকা, চৌকো, একদম স্থির ঢিবি, যে-ধরনের জিনিস দেখে মনে হয়, কেউ প্রশ্ন করবে বলে অপেক্ষা করছে।

পোস্টারে সবুজ হরফে লেখা: ডেলিভারি-কর্মীদের সই। তার নিচে: আজ। আর তার নিচে, আরও ছোট করে: পাড়ার সবচেয়ে দ্রুতেরা।

টেবিলের পেছনে হুলিতা দাঁড়িয়ে, হাত পিঠের দিকে, টিকিট বেচা লোকের মতো গম্ভীর মুখে। দোকানের শো-কেসের ওপারে মারা ফোনে কথা বলছিলেন। বরং শুনছিলেন: ছাদের দিকে তাকিয়ে মাথা নাড়ছিলেন, ফোন লম্বা হলে যেদিকে তাকান।

আমি থুতনি দিয়ে ঢিবিটা দেখালাম।

“এটা একটা স্ট্যান্ড,” আমি কিছু জিজ্ঞেস করার আগেই হুলিতা বলল। “সই করতে আরাম হবে বলে। আমি অটোগ্রাফ জমাই।”

স্ট্যান্ড, আমি যা জানি, বেহালা বাজানোর সময় স্বরলিপি রাখার কাজে লাগে। সই করার জন্য নয়। কিন্তু ও এমন নিশ্চিন্ত গলায় বলল যে দশ সেকেন্ডের জন্য বেহালা নিয়ে আমার জানা বিদ্যাতেই সন্দেহ হলো।

“কবে থেকে অটোগ্রাফ জমাচ্ছ?”

“কাল থেকে।”

কাল ও বলেছিল, ওর আরেকটা আইডিয়া আছে। আইডিয়াটার টেবিলক্লথ ছিল।

স্ট্যান্ডের ওপরে ছিল দাগ-টানা একটা কাগজ, আর একেবারে নিচে একটা চৌকো ঘর। অন্তত তাই মনে হচ্ছিল: আসলে ওটা কাঁচি দিয়ে কাটা একটা ছোট্ট জানালা। আমি নিচু হলাম। টেবিলক্লথেও ঠিক নিচে ওইরকম আরেকটা ছিল।

আমি একটা কোণ তুললাম। স্ট্যান্ডটা আসলে ৩ নম্বর, শোয়ানো, লেবেল ওপরের দিকে: তোনুর জন্য, তেরোটা “ফেরত” সিলমোহর, আর টেবিলক্লথের ফুটোর ঠিক নিচে একটা সইয়ের মাপের ফাঁকা কাগজের টুকরো।

পুরোটা বুঝলাম তখনই, যখন আঁকলাম, কারণ আমি জিনিস বুঝি এভাবেই।

কীভাবে কাজ করে

১. কাগজটা, ছোট্ট জানালা সমেত।

২. টেবিলক্লথ, ফুটো সমেত।

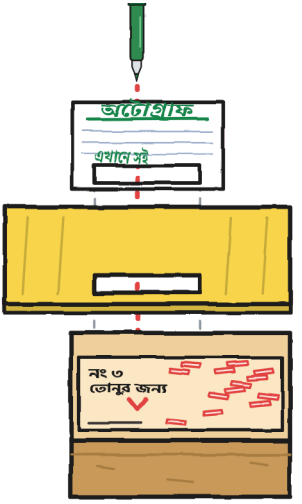

৩. ৩ নম্বরের লেবেল, যে অংশটা ফাঁকা।

৪. যে ছোট্ট জানালায় সই করে... সে লেবেলেই সই করে।

“আমার মার্কার দিয়ে,” হুলিতা খুশিতে ফিসফিস করে বলল। “যে কালি মোছে না। কাল আর ফিরবে না, আর আমরা না দেখানো পর্যন্ত ও টেরই পাবে না। সারপ্রাইজ!”

ওর মুখটা ছিল এমন কারও, যে উপহার দিচ্ছে আর খুব ভালো করে বেছেছে। এমনকি মার্কার ধরতে ধরতে ওর আঙুলের ডগাও সবুজ হয়ে গিয়েছিল।

মারার শর্তগুলো আমার মনে পড়ল। দ্বিতীয়টা আমার মুখস্থ ছিল।

“তোনিও তো বলেনি যে ওটা দোকান থেকে বেরোবে,” আমি বললাম। “দ্বিতীয় শর্ত।”

“ও কৃতজ্ঞ থাকবে।”

“আর মারা?”

“উনি ফোনে ছিলেন। আমি বলেছি, এটা অটোগ্রাফের টেবিল। আর সত্যিই তাই।”

“আর স্ট্যান্ড?”

“ওটা উনি জিজ্ঞেস করেননি।”

আমি ওকে ফ্লোরা আর আট নম্বর বীজের কথা মনে করিয়ে দিলাম: হুলিতা সময়ের আগে ফ্লোরাকে সই করতে দেয়নি।

“এটা এক নয়। ওটা ছিল অর্ধেক ডেলিভারি। এটা শর্টকাট।”

“তাহলে তুমিই করো,” আমি বললাম। “আমি না।”

আমি দোকানের সিঁড়ির ধাপে বসলাম, টেবিলের দিকে পিঠ দিয়ে, বুকে হাত আড়াআড়ি করে।

ও সিঁড়ির ধাপে বসল। খুব গম্ভীর। একটুও সাহায্য করল না। -হু.

বিজলি আমাদের রাস্তা দিয়ে যায় পাঁচটা দশে। ওদের আমরা শুনি আগে, দেখি পরে, বেলের যা ধর্ম। ওরা তিনজন, সারি বেঁধে: জোয়ি সামনে, যেখানে ও সবসময় থাকে;

ব্রুনো, বিশাল, এমন করে প্যাডেল করছে যেন আলমারি বয়ে নিচ্ছে; আর তোনিও সবার শেষে, একটু আলাদা হয়ে, যেন সারিতে তিনটে সাইকেল আছে আর ওরটা ওদের একই দলের নয়।

পরে ওদের আমি এঁকেছি, যেমন এসেছিল, একজন একজন করে।



জোয়ি, "রকেট", হলো কোমর পর্যন্ত বেণীওয়ালা সেই মেয়েটা, রবিবার যে জিজ্ঞেস করেছিল তোনিও ঝুড়িতে কী নিচ্ছে। ও সবচেয়ে দ্রুত, আর ডাকনাম দেয় ও-ই। ব্রুনোর চাকায় একটা প্যাচ লাগানো, আর সাইকেলের ফ্রেমে একটা হাওয়ার পাম্প, যদি দরকার পড়ে।

জোয়ি পোস্টারটা দেখে ব্রেক কষল।

"অটোগ্রাফ? আমাদের?" ও বলল, আর সাইকেল থেকে নেমে পড়ল।

ওদের কাছে কেউ কখনও অটোগ্রাফ চায়নি। তাই তো কাজ করছে। -হু.

জোয়ি প্রথম সই করল, নামের "ে"-র জায়গায় একটা তারা এঁকে। ব্রুনো লিখল "ব্রুনো", ধীরে ধীরে, দাঁতের ফাঁকে জিভ রেখে, প্রতিটা অক্ষর একদম গোল গোল করে। জোয়ি ওর হাত থেকে কলমটা নিয়ে নামটা এক টানে কেটে দিল আর পাশে লিখে দিল "পাংচার"।

"বিজলিতে ডাকনাম কেউ তোলে না," ব্রুনো আমাকে বুঝিয়ে বলল, একটুও রাগ না করে। "আমার চাকা একবার পাংচার হয়েছিল।"

পাংচার হয়েছিল দু-বছর আগে। একটা চাকার জন্য এটা অনেক বড় পাংচার।

তোনিও সাইকেল থেকে নামেনি। রবিবার ৩ নম্বরের দিকে যেভাবে তাকিয়েছিল, সেভাবেই টেবিলের দিকে তাকাচ্ছিল: দূর থেকে, দু-হাতে হ্যান্ডেল ধরে।

"এবার তোমার পালা, তোনিও," হুলিতা বলল। "এই যে নিচে, ঘরটায়। এটা সম্মানের জায়গা।"

আর ওকে নিজের সবুজ মার্কারটা দিল।

তোনিওর কাছে কেউ কখনও অটোগ্রাফ চায়নি। ও সাইকেল থেকে নামল আর সোজা হয়ে দাঁড়াল।

আমি মুখ ফিরিয়ে নিয়েছিলাম। সিঁড়ির ধাপ থেকে সবই দেখছিলাম, মুখ ভরা "এটা আমার ব্যাপার নয়" নিয়ে।

আমি উঠে দাঁড়ালাম। সিদ্ধান্তও নিইনি: আমার শরীরই করল, হেঁচকির মতো, আমাকে না জিজ্ঞেস করেই।

"তোনিও, দাঁ..."

আমি দেরি করে ফেললাম। তোনিও সই করার জন্য এক টানে স্ট্যান্ডটা কাছে টেনে নিল, আর টেবিলক্লথের নিচে কিছু একটা আমার আগেই কথা বলে উঠল।

"টুংটুং!"



এক সেকেন্ডের জন্য সব স্থির হয়ে গেল: কাগজ, তোনিওর হাত, মার্কার ছোট্ট জানালা থেকে এক আঙুল দূরে, ঢিবির ওপর চারটে মুখ। আমি তখনও টেবিল পর্যন্ত পৌঁছইনি।

তোনিও দুই আঙুলে একটা কোণ ধরে টেবিলক্লথ তুলল।

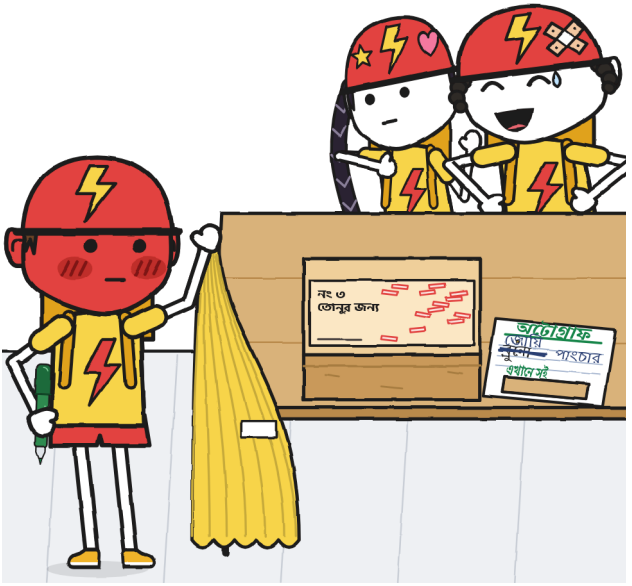

“তো-নু-র জন্য,” জোয়ি ধীরে ধীরে পড়ল, যেন কোনো পুরস্কারের নাম পড়ছে।

“তোনু?” ব্রুনো বলল, আর হেসে ফেলল।

জোয়ি হাসল না। জোয়ি ভাবছিল।

হুলিতা ছোট্ট জানালাটার দিকে চোখ নামাল।

তোনিও চেঁচাল না। আস্তে আস্তে মার্কারের ঢাকনা লাগাল, ক্লিক শব্দ না শোনা পর্যন্ত, আর কাগজটার ওপর রেখে দিল। সই না করে।

“বিজলি ফাঁদে সই করে না।”

তারপর হ্যান্ডেল ধরে হেঁটে চলে গেল, কেউ প্যাডেল না করলে সাইকেল যেমন ঘড়ির মতো টিকটিক করে, সেই আওয়াজ তুলে। কেউ পেছনে গেল না। আমিও না।

ও হেলমেটের রঙের হয়ে গিয়েছিল, ঘাড় পর্যন্ত। কিন্তু ওটা লজ্জার লাল ছিল না। অন্য কিছু ছিল।

লাল-মিটারে ওটার কোনো নম্বর নেই। -হু.

মারা বেগুনি কাপড়টা নিয়ে বেরিয়ে এলেন। দরজায় থেমে কাঁধের ওপর দিয়ে তাকের ফাঁকা জায়গাটা দেখলেন, টেবিলটা দেখলেন, আর হুলিতার দিকে তাকালেন। কে করেছে, জিজ্ঞেস করলেন না।

৩ নম্বরটা ঢেকে দু-হাতে তুলে নিলেন।

"এই পার্সেল পৌঁছে যায়নি," জোয়ি আর ব্রুনোকে বললেন। "আর লেবেলে যা লেখা আছে, সেটা তোনিওর ব্যাপার।"

ব্রুনো হাসা বন্ধ করেছিল। জোয়ি একবার পেছনে তাকাল, ততক্ষণে বেগুনি হয়ে যাওয়া চিবিটার দিকে। ওরা সাইকেলে উঠল আর বেল না বাজিয়েই চলে গেল। আমার যতদূর মনে পড়ে, এই প্রথমবার।



আমি হুলিতাকে গুছিয়ে নিতে সাহায্য করলাম: টেবিলক্লথ, পোস্টার, দুটো সই আর একটা ফুটোওয়ালা কাগজ। মার্কারটা ও-ই রাখল, ঢাকনা না খুলে। ওকে "আগেই বলেছিলাম" বললাম না। "কিছু হয়নি"-ও বললাম না, কারণ কিছু হয়েছিল।

আমরা দুজনে টেবিলক্লথটা ভাঁজ করলাম, একেকজন একটা মাথা ধরে। ধীরে ধীরে কোণগুলো কাছে আনলাম। ফুটোটা পড়ল মাঝখানে।

"তুমি তো কিছু করোনি," ও বলল।

আমাকে বাদ রাখতে বলল কথাটা। ওটা ছিল একটা উপহার, আর পুরো একটা ভাঁজ ধরে আমি ওটা নিয়ে নেওয়ার কাছাকাছি গিয়েছিলাম: আমি তো কিছু কাটিনি, কোনো তাক থেকে কিছু নামাইনি। যে ভাঁজ ছিলই না, তা সমান করলাম। আমার

মাথাটা ওর মাথার সঙ্গে মেলালাম। সিঁড়ির ধাপ থেকে টেবিল যেখানে ছিল, সেখান পর্যন্ত ফুটপাতের টালি গুনলাম।

বারোটার কম ছিল। সারা বিকেল ওগুলো আমার চোখের সামনেই ছিল।

"আমি দেরি করে সাবধান করেছি," টেবিলক্লথের দিকে তাকিয়ে বললাম। "আগেই বলতে পারতাম। কিংবা মারাকে ডাকতে পারতাম।"

হুলিতা কিছু বলল না। আমার হাত থেকে টেবিলক্লথটা নিল, দরকারের চেয়ে একবার বেশি ভাঁজ করল, আর আমাকে ফিরিয়ে দিল।

তারপর ভেতরে গিয়ে মারাকে সব বলল, একাই, কিছু বাদ না দিয়ে। আমি দরজায় দাঁড়িয়ে রইলাম, বুকে টেবিলক্লথ নিয়ে। ওখান থেকে সবই শোনা যাচ্ছিল: ছোট্ট জানালা, টেবিলক্লথ, তাক, ফোন। মারা ওকে শেষ পর্যন্ত শুনলেন।

"তোনিওকে," শেষ হলে মারা বললেন, "তুমিই বলবে।"



বুধবার তোনিও পাঁচটা দশে গেল, আর থামল না। দ্রুত গেল, সোজা সামনে তাকিয়ে, সেই গতিতে, যেটা না-থাকার আরেক রকম উপায়। পাঁচটা কুড়িতে আবার গেল: আমি শুনলাম আসছে, শুনলাম থামছে না, শুনলাম চলে যাচ্ছে। যে দশ মিনিটে নইলে বিনামূল্যে ডেলিভারি দেয়, তার পক্ষে একই রাস্তা দিয়ে তিনবার যাওয়া অথচ একবারও না থামা দোকানে না ঢোকার একটা অদ্ভুত উপায়। দরজায় টোকা দেওয়ার সঙ্গে ভালোই মিলত।

আমি সেই একই সিঁড়ির ধাপে ছিলাম।

তৃতীয়বারে হুলিতা ফুটপাতের ঠিক মাঝখানে একটা কাগজ হাতে দাঁড়িয়ে ছিল। তোনিওকে ও দু-বার যেতে দিয়েছিল।

কাগজটা দু-হাতে মুখের সামনে তুলে ধরল, বিমানবন্দরের প্ল্যাকার্ডের মতো, আর তোনিও সাইকেল থেকে না নেমে, এক পা মাটিতে রেখে, না ছুঁয়েই পড়ল। তিনটে

বাক্য আর একটা শব্দ: “আমি তোমার পার্সেলটা বের করেছিলাম”, “তোমাকে ঠকাতে চেয়েছিলাম”, “তোমার লেবেল অন্যদের দেখিয়েছি”। আর নিচে, একা, আরও বড় করে, “ক্ষমা করো”। কথাগুলো আমি হুবহু জানি, কারণ পরে ও সেটা আমার খাতায় টুকে দিয়েছিল। তাতে একটাও “কিন্তু” ছিল না, একটাও “ইচ্ছে করে নয়”, একটাও “সাহায্য করতে”। আমি খুঁজে খুঁজে দু-বার দেখেছি।

সইটা ছিল “—হুলিতা”। হুলিতা সবকিছুতে সই করে একটা হু. দিয়ে। এবার ও সবকটা অক্ষরই দিয়েছিল।

“ঠিক আছে। পড়েছি,” তোনিও বলল।

“আমাকে ক্ষমা করবে?”

ওটা কাগজে ছিল না। হুলিতা কাগজের কিনারায় আঙুল চেপে ধরল।

“আমি বলেছি যে পড়েছি।”

তোনিও প্যাডেলে পা রাখল আর চলে গেল। প্যাডেল করে, এবার, তাড়াহুড়ো ছাড়া, থামা ছাড়া। হুলিতা রাস্তার দিকে তাকিয়ে রইল, তারপর কাগজটা ডাঙ্গারির পকেটে রেখে দিল, ভাঁজ না করে।

সেদিন বিকেলে দোকানে তোনিওর বাক্সটা ফাঁকা পড়ে রইল।

আমি পুরো নাম দিয়ে সই করেছি। এটুকু তো করতেই হতো। -হু.



অধ্যায় ৪

একটা ছোট সাইকেল

বৃহস্পতিবার তোনিও রাস্তার দু-দিকে না তাকিয়েই দোকানে ঢুকল।

রবিবার ঢোকার আগে ও এদিক-ওদিক তাকিয়েছিল, যেমন রাস্তা পার হওয়ার আগে তাকায়, গাড়ির ওপর ভরসা না থাকলে। এবার ও সোজা ঢুকল, হেলমেট পরে। বিজলির এমন আর কেউ বাকি ছিল না, যার কাছ থেকে লুকোতে হয়: যে দুজনের জানার কথা, তারা মঙ্গলবারই জেনে গেছে, টেবিলক্লথ সমেত।

আমরা ওকে আশা করিনি। মঙ্গলবারের পর থেকে হুলিতা আর আমি কথা বলছিলাম কম আর সাবধানে, যেন দুজনে মিলে গ্লাসভর্তি একটা ট্রে বয়ে নিচ্ছি। হুলিতা জোরে জোরে পরিকল্পনা করা ছেড়ে দিয়েছিল, আর সেটাই সবচেয়ে চোখে পড়ত: যেমন ফ্রিজ থেমে গেলে তবেই টের পাও যে ওটা শব্দ করছিল।

ওর বগলে একটা সাইকেল।

ওর আসল সাইকেলটা বাইরে, দেওয়ালে হেলান দিয়ে রাখা ছিল। এটা ছিল লাল, আর এত ছোট যে ও ওটাকে বয়ে আনছিল, যেমন রুটি বয়ে আনে, আর হ্যান্ডেলে গুদামঘরের ধুলোর আঁশ লেগে ছিল।

ওটা ওর নয়। কিংবা, ওরই: আগেকার ওর।

ও নিজের বাক্সের পাশ দিয়ে গেল, না বসে। ওটা ঠিক সেখানেই, মারা শনিবার যেখানে রেখেছিলেন: উপুড় করা, টুলগুলোর পাশে, ফাঁকা। হুলিতা নিজের টুল থেকে উঠতে শুরু করল আর আবার বসে পড়ল। দু-বার করল।

"রবিবার থেকে আমার মাথায় একটা টুংটুং বাজছে," তোনিও বলল, মারাকে, আর আর কাউকে নয়। "মনে হয় জানি ওটা কীসের। দেখতে চাই, ঠিকঠাক মনে আছে কি না। আমি ওটা খুলতে চাই। কিন্তু এখানে নয়। যেখানে শো-কেস নেই।"

মারা কেন, জিজ্ঞেস করলেন না। ৩ নম্বরটা তাক থেকে নামালেন আর আমাদের পেছনের ঘরে নিয়ে গেলেন।

পেছনের ঘরে আছে ঢাকনাহীন একটা বাল্‌ব, সুতো আর মোড়ানোর কাগজের তাক, দেওয়ালের গায়ে স্তূপ করা ডেলিভারির বস্তা, আর একটা ছোট টেবিল, যেখানে মারা বাক্সটা রাখলেন।

"দেখার জন্য খোলা মানে সই করা নয়," তিনি বললেন, আর তোনিওর দিকে তাকিয়ে বললেন, যেমন ছাতা দেওয়া হয়: বৃষ্টি হচ্ছে বলে নয়, যদি হয় সেই জন্য। "সই না হলে ভোরে ওটা ফিরে আসবে।"

তোনিও মাথা নাড়ল।

হুলিতা দরজায় থেকে গিয়েছিল, চৌকাঠের দু-দিকে এক পা করে।

"আমি থাকতে পারি?" ও জিজ্ঞেস করল। সত্যিই জিজ্ঞেস করল।

তোনিও একটু সময় নিল। কত, জানি না: সময় মাপা হুলিতার কাজ, আর হুলিতা তখন ব্যস্ত ছিল।

"যদি কিছু না ছোঁও।"

"বাক্সও ছোঁব না, বিষয়টাও না।"

ও কোণে একটা বস্তার ওপর বসল।

তোনিও হেলমেট খুলে একটা পেরেকে ঝুলিয়ে দিল। হেলমেট ছাড়া ওর চ্যাপ্টা হয়ে বসা বাদামি চুল আর কান দুটো দেখা গেল, যেগুলো আর মঙ্গলবারের মতো লাল ছিল না। তারপর দড়িটা খুলল, মোড়কের দড়ি, কাগজের রং হয়ে গিয়েছিল যেটা। ভেতরে ছিল খবরের কাগজ, এত পুরোনো যে নিজে নিজেই ছিঁড়ে যাচ্ছিল। তোনিও আঙুলের ডগায় ওটা খুলতে লাগল। আর কাগজের মধ্যে...

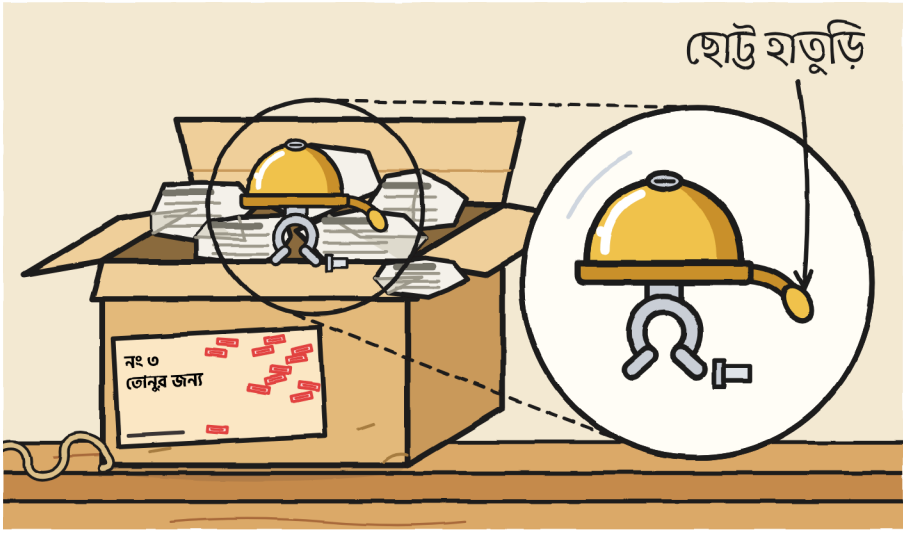

সাইকেলের একটা ঘণ্টি। ছোট্ট, সোনালি, একটা স্প্রিংয়ে আটকানো ছোট্ট হাতুড়ি সমেত: একটু নাড়ালেই বেজে ওঠে।

১ নম্বর কামড়াত। ২ নম্বর ছুটত। ৩ নম্বর শুধু বাজে।

ড্রাগন নেই, পা-ও নেই। শুধু একটা ঘাণ্টি। আমার ভালো লাগল। -হু.

কাগজের নিচে চার ভাঁজ করা একটা চিরকুট ছিল। তোনিও ওটা টেবিলে মেলল। হাতের লেখা ঠাসা, বাঁকা, চলন্ত বাসে লেখার মতো। এক কোণে একটা কালির দাগ:

"তোনু: বলেছিলাম, আবার বাজবে। এই তো বাজছে। দেরির জন্য ক্ষমা করো। —র."

আর তার নিচে:

“পুনশ্চ: হয়তো তুমি বড় হয়ে গেছ। ঘণ্টিটা হয়নি।”

তোনিও ওটা দু-বার পড়ল।

“কী বাজে হাতের লেখা,” ও বলল।

আর অনেকক্ষণ আর কিছু বলল না।

র. দেরিতে কথা রাখে। ফ্লোরা বলেছিলেন। কতটা দেরি, সেটা বলেননি। -হু.

তখন তোনিও বাক্সটা সরিয়ে ছোট সাইকেলটা টেবিলের ওপর রাখল।

আমি সাইকেলটা এঁকে ফেললাম, তির সমেত।

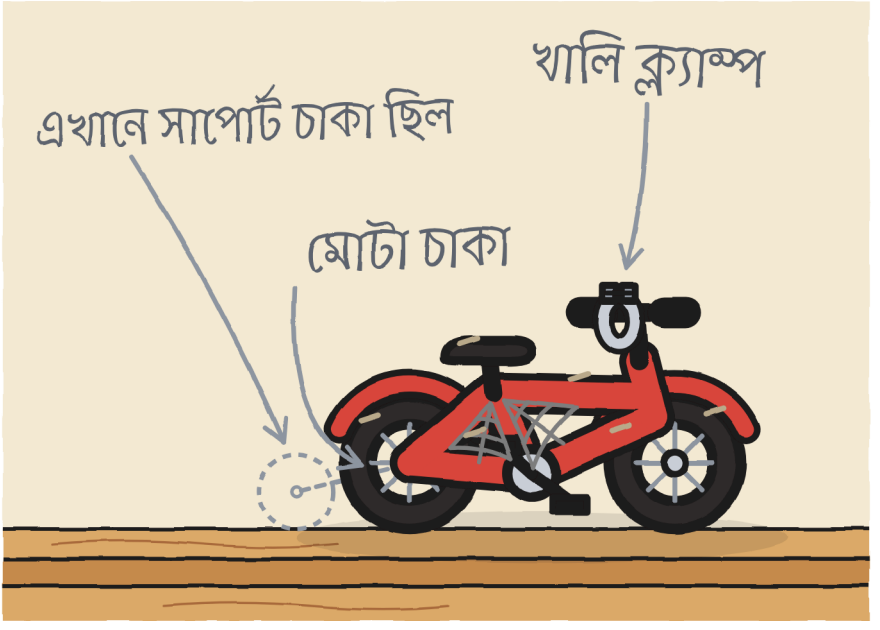

মোটা চাকা; পেছনের চাকায় দাগ, যেখানে সাপোর্ট চাকা ছিল; আর হ্যান্ডেলে খালি ক্ল্যাম্প, তার স্ক্রু সমেত।

“এটা আমার ছিল,” তোনিও বলল। “এতে এই ঘণ্টিটা লাগানো ছিল। একদিন আর বাজল না: শুধু ক্লাক ক্লাক করত। কেউ একজন আমাকে বলল, ‘দাও তো, তোনু, আমি সারিয়ে ফেরত দিচ্ছি’।”

“কে?” হুলিতার মুখ ফসকে বেরিয়ে গেল, আর ও দু-হাতে মুখ চেপে ধরল।

“মুখটা মনে নেই। ঘণ্টিটা মনে আছে। আর মনে আছে, আমি অনেক অপেক্ষা করেছিলাম।”

হুলিতা তখনও দু-হাত মুখে চেপে ছিল।

“বাড়িতে এখনও আমাকে তোনু বলে ডাকে,” তোনিও বলল। “বিজলিতে না। বিজলিতে আমি তোনিও: প্রথম দিনই নিজের কার্ডে আমি ওটা লিখেছিলাম।”

আমি কল্পনা করলাম ও বিজলির কলম দিয়ে নামের ঘরে তোনিও লিখছে, কেউ কিছু না বলতেই: পাড়ার একমাত্র নাম, যেটা অন্য কেউ ওকে দেয়নি।

“তোনুর মধ্যে খারাপ কী?” আমি জিজ্ঞেস করলাম। সত্যিই জিজ্ঞেস করলাম, কোনো মতলব ছাড়া। প্রশ্নের বেলায় আমার হয় হেঁচকির মতো: বেরিয়ে আসে।

“কিছু না। যতক্ষণ না জোয়ি বলে। বিজলিতে ডাকনাম কেউ তোলে না। ব্রুনোকে দেখো।”

“মঙ্গলবার থেকে ব্রুনো আমাকে ছয়বার তোনু বলে ডেকেছে,” ও যোগ করল। “আমি গুনেছি।”

হুলিতা নিজের কোণে ছোট্ট হয়ে গেল।

কেউ জানত না কীভাবে এগোবে। তখন হুলিতা জিজ্ঞেস করল:

“এখনও কি ওতে বসতে পারো?”

নিজেকে আটকাতে পারল না।

মারা সাইকেলটা টেবিল থেকে মাটিতে নামালেন, যে সাবধানে উঁচু টুল থেকে কাউকে নামানো হয়, সেই সাবধানে। তোনিও সাইকেলটার দিকে তাকাল। মারার দিকে তাকাল। বসল।

বসা গেল। মোটামুটি। হাঁটু উঠে এসেছে কান পর্যন্ত, আর কনুই দু-পাশে বেরিয়ে।

মারা এমন একটা আওয়াজ করলেন, যা অন্য কারও মুখে হলে হাসি হতো। তোনিওও হাসল। শনিবারের পর থেকে ওকে আর হাসতে দেখিনি। মঙ্গলবার হেসেছিল ব্রুনো; এবার হাসল ও। একই আওয়াজ নয়।

লাল-মিটার: ০। এটাও লিখে রাখছি, কারণ এটাও গোনায় পড়ে। -হু.

আমার একটা কথা মাথায় এসেছিল, আর আমাকে ঠিক করতে হলো, সেটা বলা সাহায্য করা, না ঠেলে দেওয়া। তোনিওর বেলায়, ওভাবে বসে, এমন একটা সাইকেলের ওপর গুটিসুটি হয়ে, যেটা আর ওর মাপের নয়, ফারাকটা আমার চুলের মতো সরু মনে হলো। কথাটা আমি বললাম তথ্য হিসেবে, পরামর্শ হিসেবে নয়।

"তোমার এখনকার সাইকেলে তো একটা বেল আছেই," আমি বললাম। "বিজলির বেল। এটা লাগাতেই হবে, এমন তো নয়। রেখে দিতে পারো। কিংবা ফিরে যেতে দিতে পারো।"

"জানি," তোনিও বলল।

কিন্তু আমার দিকে এমনভাবে তাকাল, যেন কেউ আগে কখনও ওকে এটা বলেনি।

নিজের কোণ থেকে হুলিতা আমার কথা শুনে মাথা তুলল। কিছু বলল না। বোঝা গেল, ও কথাটা তুলে রাখছে।

ও এগারো মিনিট চুপ করে ছিল, শুনছিল, মার্কার বন্ধ করে, ডাঙ্গারির পকেটে দু-হাত ঢুকিয়ে। এগারো মিনিটের কথা আমি জানি, কারণ পরে ও নিজেই আমার খাতায় লিখে দিয়েছিল।

এগারো মিনিট। আমার জিভ ঘুমিয়ে পড়েছিল। -হু.

“আমি এটা একা চেষ্টা করে দেখতে চাই,” তোনিও বলল।

আমরা তিনজন বেরিয়ে এলাম। তোনিও পেছনের ঘরের দরজা বন্ধ করে দিল।

হুলিতা দোকানের উল্টো প্রান্তে চলে গেল, না শোনার জন্য। আমি, না শোনার জন্য, আঁকলাম: তোনিওর আসনে এখন চাঁদোয়াও আছে। তবুও শোনা গেল। মারা এমন কিছু দড়ি গোছালেন, যেগুলো আগেই গোছানো ছিল।

টুংটুং।

এ সেই শনিবারের টুংটুংই। তারপর আরেকটা। তারপর অনেকক্ষণ আর একটাও না। আমরা তিনজনের কেউ দরজার দিকে তাকাচ্ছিলাম না।

যখন বেরিয়ে এল, এক হাতে ঘণ্টি, বগলে বাক্স। ছোট সাইকেলটা পেছনের ঘরে রয়ে গেল, বস্তার গায়ে হেলান দিয়ে, খালি ক্ল্যাম্প নিয়ে।

“আমি এটা কাল পর্যন্ত নিয়ে যাচ্ছি। সই না করে।”

“তাহলে ভোরে ওটা ফিরে আসবে,” মারা বললেন।

“ফিরে আসুক। আমি জানতে চাই, এক রাত ওটাকে কাছে রাখা কেমন।”

“আর যদি ঘণ্টিটা বাক্সের বাইরে রেখে দেয়?” আমি জিজ্ঞেস করলাম।

“কখনও পরখ করে দেখিনি,” মারা বললেন। “আর সকাল সাতটায় সেটা পরখ করার ইচ্ছেও নেই।”

তোনিও সবকিছু বাক্সের ভেতরেই রাখল: ঘণ্টি আর চিরকুট।



শুক্রবার ভোরে আমার রাস্তা আবার বেজে উঠল: টুংটুং, টুংটুং, টুংটুং, ছাদের ওপর দিয়ে, কোনো তাড়া ছাড়াই। সেই তিনটে জানালাতেই আলো জ্বলল। সেই কুকুরটাই ডাকল। ফেরা নং ১৪।

তার আগেরটা আমি দেখিনি। সেদিন বিকেলে তোনিও আমাকে বলেছিল, নিজের বাক্স থেকে, মাটির দিকে তাকিয়ে:

“এবার ও পাপোশে ঘুমোয়নি। আমার বিছানার পাশের টেবিলে ঘুমিয়েছিল। ভোরে কাচে ঠোকাঠুকি করতে শুরু করল, আর আমি জানালাটা খুলে দিলাম।”

“আর কেমন?” আমি জিজ্ঞেস করলাম। “এক রাত ওটাকে কাছে রাখা?”

তোনিও একটু সময় নিল।

“লম্বা,” বলল।



একটা পার্সেলের জন্য জানালা খুলে দিল। কী ভদ্র। -হু.

সেদিন বিকেলে আমি তোনিওর দুটো সাইকেল পাশাপাশি আঁকলাম। এখনকারটায় ঘণ্টিটা বসিয়ে দিলাম, যেটা দারুণ মানিয়েছে। নিচে লিখলাম “আগে” আর “এখন”।

হুলিতা তার ওপর একটা ছোট কাগজ সেঁটে দিল, ঠিক হ্যান্ডেলে, আমার সদ্য আঁকা ঘণ্টিটা ঢেকে:

এখনও লাগায়নি। -হু.

আমি নখ দিয়ে একটা কোণ ধরে ওটা তোলার চেষ্টা করলাম।

ও ঠিকই বলেছে। এটা আমাকে একটু জ্বালায়।

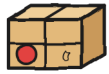

অধ্যায় ৫

একান্তে

শুক্রবার বিকেলে ৩ নম্বর নিজের তাকে ছিল, চোদ্দোটা সিলমোহর নিয়ে।

তোনিও, নিজের বাক্সে, দূর থেকে ওটার দিকে তাকিয়ে ছিল।

হুলিতা দু-দিন ধরে কিছু একটা বানাচ্ছিল। আমি জানতাম, কারণ দু-দিন ধরে ও আমাকে বলছিল না কী।

আমি সবচেয়ে খারাপটার ভয় পেলাম। শেষবার যখন হুলিতা গোপনে কিছু বানিয়েছিল, গোপন জিনিসটার টেবিলক্লথ ছিল।

এবার আমি সবার আগে দেখলাম টেবিলক্লথ নেই। না টেবিল, না স্ট্যান্ড, না কাঁচি দিয়ে কাটা ছোট্ট জানালা: শুধু খাতার একটা কাগজ, দাগ-টানা। হুলিতা কিছু না বলে ওটা তোনিওর হাঁটুর ওপর রাখল আর দেওয়ালের দিকে পিছিয়ে গেল, হাত পিঠের দিকে, দরকারের চেয়ে দু-পা বেশি। আমি গুনলাম।

ওটা ছিল দুটো বিকল্পওয়ালা একটা কাগজ।

তোনিও কাগজটা দু-বার পড়ল; দ্বিতীয়বার শুধু B-টা। আমি, পেরিস্কোপের মতো সতর্কতায় ওর কাঁধের ওপর দিয়ে উঁকি দিয়ে, ওটা তিনবার পড়লাম, ফাঁদ খুঁজে।



তোনিও চোখ তুলে মারার দিকে তাকাল।

“আমি সই করলে কে জানবে?”

কথাটা বলল কান দুটো ১ নম্বরে নিয়ে।

“আমি। আর আমার রেজিস্টার, যেটা এই ড্রয়ার থেকে বেরোয় না।”

মারা কাউন্টারের ড্রয়ারটা এটুকু খুললেন যাতে দেখা যায়: মোটা একটা রেজিস্টার, রাবার ব্যান্ডে বাঁধা। কোমর দিয়ে ড্রয়ার ঠেলে বন্ধ করলেন।

“আর বিজলি?”

“আমি বিজলিকে বলব না। রেজিস্টার তো কোনো পোস্টার নয়।”

হুলিতা মুখ খুলল আর আবার বন্ধ করল। মারার পেছনে, দেওয়ালে, সবুজ পোস্টারটা তখনও বলছিল বাকি ১৮।

পোস্টারে থাকে সংখ্যা। নাম থাকে ড্রয়ারে। -হু.

তোনিও নিজের বাক্স থেকে উঠে দাঁড়াল। বাক্সটা ফাঁপা একটা আওয়াজ করল, যে বাক্সে আর কেউ বসার নেই, তার আওয়াজ।

"আমি B নিচ্ছি।"

হুলিতা লাফিয়ে উঠল না। আমি দেখলাম, ও লাফায়নি।

ও মুঠো এমন চেপে ধরল যে আঙুলের গাঁট সাদা হয়ে গেল।

"পেছনের ঘরে," তোনিও বলে চলল। "আর আমি চাই তোমরা থাকো। তোমরা দুজনই।"

"আমিও?" হুলিতা জিজ্ঞেস করল।

"আমি সই করি, এটা তুমিই সবচেয়ে বেশি চাও। তোমাকে সামনে রাখাই ভালো।"

আমার ভাগে পড়ল ৩ নম্বরটা তাক থেকে নামানো। নীল টুলে উঠে দু-হাতে নামালাম, দম বন্ধ করে, যেমন কেউ কানায় কানায় ভরা স্যুপের প্লেট বয়ে নেয়। তবু বাজল: ছোট্ট একটা টুংটুং, ভদ্রতার, যার মানে "অনুমতি নিয়ে"।



আমরা পেছনের ঘরে ফিরে গেলাম। তোনিও হেলমেট খুলে একটা বস্তার ওপর রাখল, ফিতে ঝুলিয়ে।

আমি ৩ নম্বরটা টেবিলে রাখলাম। তোনিও ঢাকনা তুলে আবার ঘণ্টি আর চিরকুটটা বের করল। বাল্বের নিচে রাখল: ঘণ্টিটা, সোনালি, কাত করে, হাতুড়িটা স্প্রিংয়ে স্থির; চিরকুটটা, মেলে ধরে হাতের কিনারা দিয়ে সমান করা, র.-এর বাজে হাতের লেখা সমেত, যেটা ওই আলোয় একটা ছবির মতো লাগছিল।

ও ওগুলোর দিকে ধীরে ধীরে তাকাল, যেমন কেউ ভাঙতি গোনে।

"সই করার আগে আমি দেখি, কীসে সই করছি," ও বলল, কারও দিকে না তাকিয়ে।

হুলিতা নিজের টি-শার্টের রঙে রাঙা হয়ে উঠল।

হুলিতা ওকে নিজের সবুজ মার্কারটা দিল, ঢাকনা লাগানো। পেছন দিকটা এগিয়ে, মুখ নিজের দিকে করে, যেভাবে কাঁচি দেওয়া হয়। তারপর কোণে গিয়ে একটা বস্তার ওপর বসল, একদম সোজা, থুতনি উঁচু করে, কনুই দুটো কেমন বেঁকে।

“কী করছ?” আমি জিজ্ঞেস করলাম।

“নিজের হাতের ওপর বসেছি। যাতে সাহায্য না করে ফেলি।”

আক্ষরিক অর্থেই। হাত দুটো ও ঊরুর নিচে গুঁজে দিয়েছিল, দু-পাশে একটা করে, আর তাই দিয়ে বস্তাটা চেপে ধরেছিল। ঠোঁট নড়ছিল; মনে হয় ও হাতি গুনছিল।

আমি বিছানায় শুয়ে মহড়া দিয়েছিলাম, দরকার পড়লে কীভাবে সময়মতো সাবধান করব। সেদিন বিকেলে কিছু বলতেই হলো না।

আমি খাতা বন্ধ করে বগলে চেপে ধরলাম।

তারপর ও সবকিছু লিখে রাখল। -হু.

তোনিও মার্কারের ঢাকনা খুলে সই করল।

দ্বিধা করেনি, কিন্তু সময় নিল। তো, বড় করে। নি, ই-কারটা ধীরে টেনে। ও। তিনটে অক্ষর, স্পষ্ট আর সোজা।

কোণে একটা সিলমোহর ফুটে উঠল, যেটা কেউ ছাপেনি: পৌঁছে গেছে।

লেবেলে লেখা ছিল “তোনু”। সইয়ে “তোনিও”।

“এভাবে চলবে?” ও মারাকে জিজ্ঞেস করল। “নামটা তো এক নয়।”

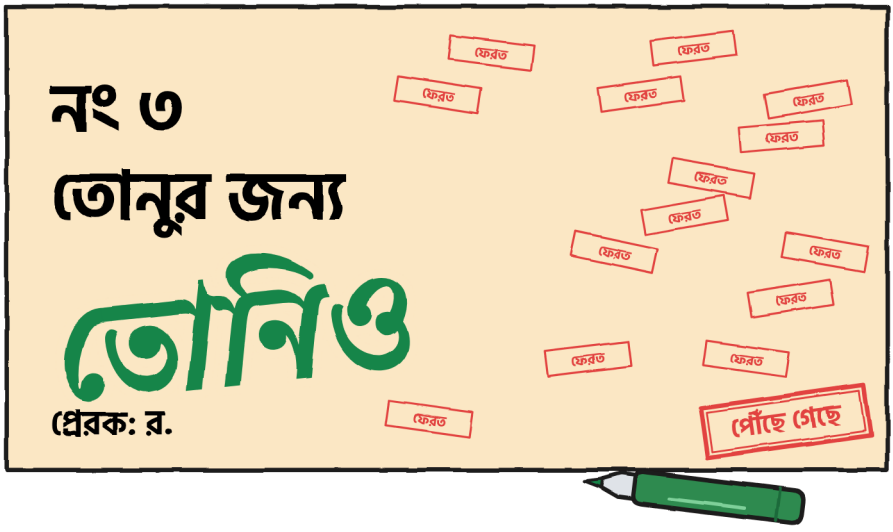

মারা ওপর থেকে নিচ পর্যন্ত লেবেলটা পড়লেন, না ছুঁয়ে।

"সই করে সে, যে পার্সেল নেয়," তিনি বললেন। "আর পার্সেলটা তুমিই নিয়েছ।"



আমরা দোকানে ফিরলাম। তোনিওর এক হাতে ঘণ্টি, আর আবার হেলমেট মাথায়। আমার খাতা তখনও বন্ধ। মারা বাল্‌ব নিভিয়ে সবার শেষে এলেন।

ড্‌রয়ার খুলে, রাবার ব্‌যান্ডে বাঁধা রেজিস্টারটা বের করে ডেলিভারিটা লিখে রাখলেন: একটা তারিখ, একটা নম্‌বর আর তিনটে অক্ষর।

হুলিতার হাতে তখন নীল টুলটা, সেই যেটা ও রোজ পোস্টারের কাছে পৌঁছতে ব্‌যবহার করে, আর ও দেওয়ালের দিকে যাচ্ছিল। হঠাৎ থেমে গেল। টুলটা আবার মেঝেতে নামিয়ে রাখল, পায়া নিচে, কোনো শব্দ না করে।

"আমি কি পোস্টারটা বদলাতে পারি?" ও জিজ্ঞেস করল।

ও জিজ্ঞেস করল তোনিওকে, মারাকে নয়।

তোনিও পোস্টারটার দিকে তাকাল। সময় নিল, যেমন ঠিকানা মিলিয়ে দেখতে সময় লাগে।

“এখানে তো শুধু একটা সংখ্যা লেখা।”

“শুধু।”

“ঠিক আছে।”

হুলিতা টুলে উঠে ১৮ এক টানে কেটে দিল আর পাশে লিখল বিশাল একটা ১৭, যে সবুজ মোছে না, তাই দিয়ে।

আমি আগে জিজ্ঞেস করেছি, মনে রেখো। -হু.

তোনিও ফুটপাতে বেরোল, সাইকেলটা দেওয়ালে ঠেকাল, আর ব্যাগ থেকে একটা স্ক্রু-ড্রাইভার বের করল।

“ওটা কি লাগাবে?” আমি জিজ্ঞেস করলাম।

“হ্যাঁ।”

“আর বিজলির বেল?”

“ওটা বিজলির। এটা আমার।” আর যোগ করল, চোখ না তুলে: “সাইকেলটা একটু ধরবে?”

ওটা ও-ই লাগাল। আমি শুধু সাইকেলটা ধরে রেখেছিলাম, তাও ও বলেছিল বলে। ক্ল্যাম্পটা হ্যান্ডেলের চারপাশে এঁটে গেল, বিজলির ধূসর বেলের পাশে। তোনিও স্ক্রু ততটাই কষল, যতটা ওর মনে হলো যথেষ্ট। মারা দরজা থেকে দেখছিলেন, বুকে হাত আড়াআড়ি করে, যেটা ওঁর পক্ষে হাততালি দেওয়ার এক উপায়।

তারপর ও এক আঙুলে ছোট্ট হাতুড়িটা ছুঁয়ে দিল।

টুংটুং।

পাঁচটা দশে বিজলি গেল। ওরা সারি বেঁধে রাস্তা দিয়ে আসছিল: সামনে জোয়ি, বেণী হাওয়ায় উড়িয়ে; পেছনে ব্রুনো, ফ্রেমে হাওয়ার পাম্প নিয়ে; আর একেবারে শেষে তোনিওর মাপের একটা ফাঁক। ব্রুনো ব্রেক কষল।

“ওটা কী বাজছে?”

“একটা ঘণ্টি।”

“কোথা থেকে এল?”

“আমার ছিল।”

“যখন তুমি তোনু ছিলে, তখনকার?”

আমি তোনিওর মুখের দিকে তাকালাম। কিছু না। কান পর্যন্ত না।



“যখন আমাকে ওই নামে ডাকা হতো, তখনকার। এখন আমার নাম তোনিও। আর তোমার নাম কী?”

“পাং...” ব্রুনো থেমে গেল। “ব্রুনো।”

“তাহলে ওটাই, ব্রুনো।”

ব্রুনো মাথা তুলল, যেমন কেউ মাইকে নিজের নাম শোনে। বিজলিতে দু-বছর ধরে কেউ ওকে ব্রুনো বলে ডাকেনি।

জোয়ি মুখ খুলল।

মঙ্গলবার ও “ব্রুনো” কেটে লিখেছিল “পাংচার”।

তোনিও ছোট্ট হাতুড়িটা ছুঁয়ে দিল। একবার, কারও দিকে না তাকিয়ে।

টুংটুং।

জোয়ি মুখ বন্ধ করল। একটু ভাবল। ট্রাফিক সিগন্যালে হলুদ বাতি যতক্ষণ থাকে, ততক্ষণ।

“ভালোই বাজে,” ও বলল। “আমাদের দেরি হয়ে যাচ্ছে, তোনিও।”

ও বলল “তোনিও”। আর কিছু যোগ করেনি। -হু.

ওরা সারি বেঁধে চলে গেল, জোয়ি, ব্রুনো আর, সবার শেষে, তোনিও, বুড়ো আঙুল সবসময় ছোট্ট হাতুড়ির কাছে রেখে।



সেই রাতে আমি আবার খড়খড়ি তুলে রাখলাম।

নজরদারির দুটো চেয়ারও রাখলাম জানালার সামনে, আমারটা আর অ্যালার্ম ঘড়ির ছোট্টটা, ঐতিহ্য রক্ষার জন্য, আর অ্যালার্ম ঘড়ি বগলে নিয়ে বিছানায় ঢুকলাম। সেই রাতে আমি শুয়ে শুয়ে নজর রাখছিলাম।

“আবার নজর রাখছ?” আমার মা করিডোর থেকে জিজ্ঞেস করল।

“আজ নজর রাখছি, যাতে কিছু না ঘটে।”

“ওটা আমি দারুণ পারি। এবার ঘুমোও।”

প্রায় বারোটা পর্যন্ত টিকে ছিলাম।

আমি মার্কারের ঢাকনা খোলা রেখেই ঘুমিয়ে পড়েছিলাম। আমার বালিশ এখন সবুজ। -হু.

অ্যালার্ম বাজার আগেই আমার ঘুম ভাঙল, পুরো শরীর একটা টুংটুংয়ের জন্য তৈরি হয়ে।

ভোর হলো।

কিছুই বাজল না।

একটা টুংটুংও না, একটা জানালাও না, চার নম্বরের কুকুরটাও না।

আমার রাস্তায় আমি এ পর্যন্ত যত নীরবতা শুনেছি, এটা তার মধ্যে সবচেয়ে সুন্দর।





অধ্যায় ৬

আপাতত

শনিবার দশটায় আমি তাকটা আঁকলাম: সতেরোটা পার্সেল আর তিনটে ফাঁকা জায়গা।

আমি রাস্তা পার হয়েছিলাম জামাকাপড় পরে, সেটাই এক উন্নতি: প্রথম শনিবার করেছিলাম রাতের পোশাকে আর বাড়ির চটি পায়ে। ঢোকার আগে আমি দরজার ওপরের ছোট্ট জানালাটা দেখলাম, যেটা ফিরে আসাদের জন্য মারা খোলা রাখেন। খোলাই ছিল। কেউ ঢোকেনি।

পার্সেলের চেয়ে ফাঁকা জায়গাগুলো আঁকতে আমার বেশি সময় লাগল। প্রতিটায় একটা পরিষ্কার আয়তক্ষেত্র, চারপাশে ধুলো। আমি পেনসিলে চাপ না দিয়ে আঁকলাম।

মারা ইতিমধ্যে ড্রয়ার থেকে নিজের রেজিস্টার বের করে কাউন্টারে খুলে ধরেছেন, দরজার দিকে পিঠ করে। ৩ নম্বরের লেবেলটা খুলে নিজের রেজিস্টারে সেঁটে দিলেন, অন্য দুটোর পাশে।

তোনিও, যে শনিবারের শাস্তি খাটে ঠিক যেমন ডেলিভারি করে, সময়মতো, আর গা থেকে কিছু না খুলে, কাউন্টারের ওপারে দাঁড়িয়ে দেখছিল, হেলমেট পরে। ওর নাম, সইয়ের নামটা, বাক্স থেকে রেজিস্টারে চলে গিয়েছিল। ও রেজিস্টারটা দেখল। বন্ধ দরজাটা দেখল। আবার রেজিস্টারটা দেখল, একটু বেশিক্ষণ।



সাঁইত্রিশটা সিলমোহর: তেইশ আর চোদ্দো। সবুজে তিনটে সই।

একটা ডিম, কিছু বীজ আর একটা ঘণ্টি। তিনটেই পৌঁছেছে দেরিতে। তিনটেই পৌঁছেছে।

তৃতীয়টায় সই করল তোনিও। এবার আমি শুধু ওকে মার্কারটা এগিয়ে দিয়েছি। -হু.

তোনিও নিজের বাক্সে বসে নড়েচড়ে উঠল। এবার ও তাকের দিকে তাকাল না।

"বাক্সটা এখনও 'আপাতত'-ই," মারা বললেন, রেজিস্টার থেকে চোখ না তুলে।

"আপাতত আমার চলবে," তোনিও বলল।

"আপাতত" বছরের পর বছর চলতে পারে। ৩ নম্বরকে জিজ্ঞেস করো। -হু.

আমি তোনিওকে ওর আসনের জন্য আমার নকশাটা দেখালাম। পুরো সপ্তাহ লেগেছিল।

ওটা ছিল চূড়ান্ত ভার্সন, মাপ আর চিহ্নের ব্যাখ্যা সমেত: ডেলিভারি-বাক্স বদলে সিংহাসন। তাতে জুড়েছিলাম ঝড়ের রাতের পিঠের ঠেস; ভার্সন ২-এর হাত রাখার ঠেস আর গ্লাসের জায়গা; ৩-এর ঝালর-দেওয়া চাঁদোয়া, আর ঝালর-দেওয়া একটা নতুন কার্পেট। অ্যান্টেনাটা আপনা থেকেই এসে গেছে, রাত বারোটায়; ওটা কী ধরতে চাইছিল জানি না, আর সেজন্যই রেখে দিয়েছি।

আমি ওটা দু-হাতে এগিয়ে দিলাম, সনদপত্রের মতো। তোনিও পুরোটা দেখল, র.-এর চিরকুট পড়ার সময় যে গাম্ভীর্য ছিল, ঠিক সেই গাম্ভীর্যে। একবারও হাসল না। আমি ওটার কদর করলাম। হুলিতা আমার কাঁধের ওপর দিয়ে দেখল, ছবিতে আত্মীয়কে চিনতে পারার মুখ করে।

“আমাকে এটা দেবে?” তোনিও বলল।

ও ওটা চার ভাঁজ করে বাক্সের ওপর রাখল আর তার ওপর বসে পড়ল।

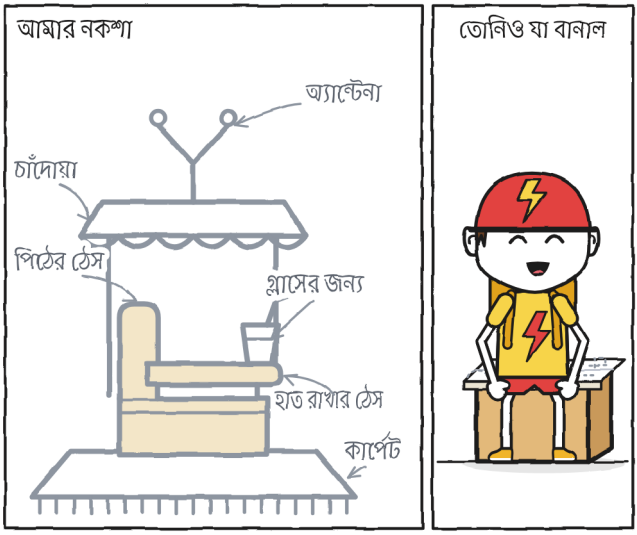



বাইরে ঘণ্টিটা হ্যান্ডেলে বেঁকে গিয়েছিল। হাওয়া খেতে বেরিয়ে আমরা দেখলাম: একদিকে আধপাক ঝুঁকে পড়েছে, বাসে ঘুমিয়ে পড়া মাথার মতো।

“তুমি যখন টাইট করবে, আমি ধরে রাখি,” আমি বললাম।

“আমি পারব।”

ও-ই পারল। আমি ওই স্ক্রুটার দিকে তাকিয়ে ছিলাম। মনে হচ্ছিল ওতে একশো প্যাঁচ।

তোনিও জিভের ডগা বের করল। আমার পাশে হুলিতা ডাঙ্গারির পকেটে কবজি পর্যন্ত হাত ঢুকিয়ে রেখেছিল; ভেতরে মুঠো বোঝা যাচ্ছিল। আমার তো ডাঙ্গারি নেই: আমি এক হাত দিয়ে অন্য হাত পিঠের দিকে চেপে ধরলাম।

তোনিও শেষ পাক দিতেই ঘণ্টিটা সামনের দিকে তাকিয়ে রইল, সৈনিকের মতো সোজা।

"হয়ে গেছে," ও বলল।

আমি নিজের হাত নিজে ছেড়ে দিলাম, যেটা দেখতে যত সহজ, তত নয়।

ভেতরে ঢুকে হুলিতা কাউন্টারের নিচ থেকে অটোগ্রাফের কাগজটা বের করল। তাতে দুটো সই, একটা ফুটো, আর সেদিন সকাল থেকে একটা তালি: ছোট্ট জানালাটা কাগজের টুকরো আর এত টেপ দিয়ে ঢাকা যে তালিটাই ছিল কাগজের সবচেয়ে শক্ত জায়গা।

"এটা সেই ফাঁদের কাগজটা," মারা জিজ্ঞেস করার আগেই ও বলল। "আমি ঠিক করে দিয়েছি।"

তারপর কাগজটা তোনিওর সামনে রাখল।

"আমাকে একটা অটোগ্রাফ দেবে? সত্যিকারের। নিচে কিছু নেই।"

ধীরে বলল, একবারই, আর অপেক্ষা করল।

তোনিও কাগজের নিচে দেখল। কাউন্টারের নিচে দেখল। ব্যাঙটাকে উল্টে দেখল।

তোনিও ব্যাঙটা তুলতেই হুলিতার মুখের একটা পেশি নড়ে উঠল। ওটাই ছিল একমাত্র আপত্তি। ও নিজেই ওটা ফিরিয়ে নিল।

"ঠিক আছে।"

তালির ওপরেই সই করল: “তোনিও”, শেষ অক্ষরটা থেকে ঝুলছে একটা বিদ্যুৎ-রেখা।

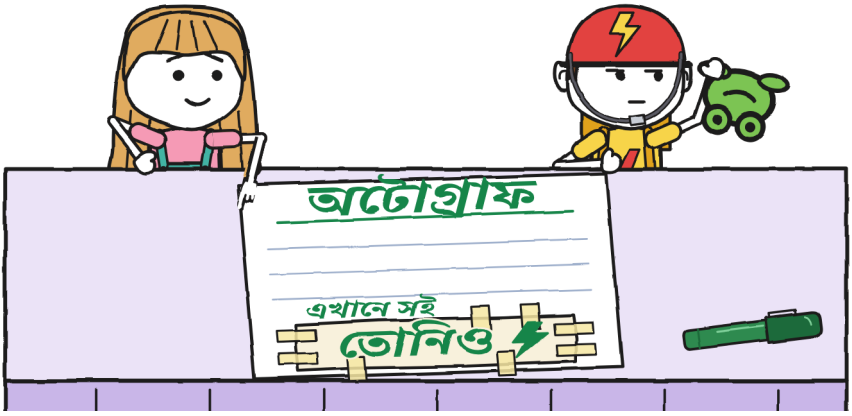

আমার প্রাপ্য। -হু.



দুপুরে তোনিও একটা ডেলিভারিতে বেরোল। আমি দরজা থেকে ওকে যেতে দেখলাম, ঘণ্টি নিজের জায়গায় শক্ত করে বসানো। টুপি পরা এক ভদ্রলোক লাঠি হাতে আস্তে আস্তে রাস্তা পার হচ্ছিলেন, মোড়ের জেব্রা ক্রসিং ধরে।

তোনিও থামল। এক পা মাটিতে রেখে অপেক্ষা করল। তারপর ঘণ্টিটা মাত্র একবার বাজাল, যাতে ভদ্রলোক জানতে পারেন ও ওখানে আছে।

টুংটুং।

ভদ্রলোক অভিবাদনের জন্য লাঠি তুললেন, আর নিজের গতিতেই এগিয়ে গেলেন।

মারা আমার পাশে দরজায় এসে দাঁড়িয়েছিলেন, বুকে হাত আড়াআড়ি করে।

“উনি দন আন্তোনিও,” বললেন। “আমার তালিকার দু-নম্বর তোনু।”

ইনিই ছিলেন সেই “আমার তো ইচ্ছেই আছে”-র মানুষ। আমাদের ফুটপাত পর্যন্ত এসে তোনিওর সাইকেলের পাশে থামলেন, যেটা যায়নি: ও সেখানেই, এক পা মাটিতে আর হাত ছোট্ট হাতুড়ির কাছে, কোনো তাড়া ছাড়া।

“ওই ঘণ্টিটা কি নতুন?” ভদ্রলোক জিজ্ঞেস করলেন।

“পুরোনো,” তোনিও বলল। “আমার ছিল। যখন আমাকে তোনু বলে ডাকত।”

“আমাকে ষাট বছর ধরে কেউ ওই নামে ডাকে না। চাইলে অদলবদল করি: তুমি হবে দন আন্তোনিও, আমি তোনু।”

তোনিও ভাবল। টুপির দিকে তাকাল, তারপর নিজের হ্যান্ডেলের দিকে।

“আপাতত না।”

দন আন্তোনিও মাথা নাড়লেন আর এক আঙুলে টুপি ছুঁলেন, যেমন কেউ চুক্তি পাকা করে আবার খোলা রাখে।

“আমি এখানেই আছি,” বললেন। “আমি আস্তে পার হই।”



তোনিও ডেলিভারি থেকে ফিরল বারো মিনিটে। হুলিতা সময় মেপেছিল। নিজের ঘড়ির দিকে তাকিয়ে রইল, কিছু বলল না। তোনিও নিজের বাক্সে বসল।

আমি র.-এর কার্ডটা বের করলাম। একটা পাতা, তাতে একটা বড় প্রশ্নচিহ্নের ছবি আর নিচে র., আর ছিল ছয়টা সূত্র। আমি আরও দুটো যোগ করলাম:

- সূত্র ৭. তোনিও যখন ছোট সাইকেল চালাত, তখন ওকে চিনত।
- সূত্র ৮. ওকে এমন একটা ঘণ্টির কথা দিয়েছিল, যেটা বাজবে। বছরের পর বছর লাগল।

তোনিও আমার কলমটা চাইল আর নিচে নিজের হাতের লেখায় লিখল। তালিকার বাইরে, ডেলিভারি-কর্মীর ঠাসা, চেপে লেখা হরফে, যে ধরনের হরফ নিচের পাতাতেও বোঝা যায়:

বাকি: আমার কাছে একটা কৈফিয়ত পাওনা আছে।

"আর ওকে ধন্যবাদও দেবে না?" হুলিতা জিজ্ঞেস করল। ধীরে জিজ্ঞেস করল, যেমন কেউ কানায় ভরা কাপ বয়ে নেয়।

"ধন্যবাদ আর অভিযোগ। দুটোই। যখন জানব কাকে।"



একটায় ভেরা ঢুকলেন, কোলে টুকরো, চুলে একটা ডাল।

"সাহায্য চাইতে এসেছি," বললেন। "টুকরো এখন উড়তে শিখে গেছে। এবার ওর দরকার নামার একটা নিরাপদ জায়গা।" একটু থামলেন। "কাল ও আমার স্যুপটাকেই বেছে নিয়েছে।"

প্রথম শব্দ থেকেই আমি টুলে সোজা হয়ে বসলাম। টুকরোর একটা শিং থেকে একটা নুডলস ঝুলছিল। ও আমার দিকে তাকাল আর আমার সেই "আমি করিনি" মুখটা করল।

হুবহু তোমার মুখ। নুডলসমেত। -হু.

"তোমার কি কারও তাড়াতাড়ি দরকার?" তোনিও নিজের বাক্স থেকে জিজ্ঞেস করল।

টুকরো ভেরার কোল থেকে ঝুঁকে ওর হেলমেট শুঁকল।

"আমার দরকার এমন কাউকে, যে অপেক্ষা করতে জানে," ভেরা বললেন।

"আমিও জানি। এই সপ্তাহ থেকে।"

ওর পেছনে হুলিতা দু-হাত তুলল, ভীষণ ভদ্র ডাকাতিতে যেমন কেউ আত্মসমর্পণ করে।

আমিও অপেক্ষা করতে জানি। এবার কি? -হু.

কিছু না বুঝলে আমি একটা তালিকা বানাই। এবার আমি বুঝেছিলাম, তবু তালিকা বেরোল: এই খাতার শেষ পাতা, ডেলিভারির ছক।

ডেলিভারি নং ৩। কার কতক্ষণ লাগল:

- বিজলি: দশ মিনিট।
- র.: বছরের পর বছর।
- তোনিও: ছয় দিন।
- হুলিতা, শুনে: এগারো মিনিট (রেকর্ড)।

তোনিও নিজের বাক্স থেকে উঠল, হেলমেট ঠিক করল আর এক আঙুলে দেখে নিল ঘণ্টিটা তখনও সোজা কি না। সোজাই ছিল।

ও নিজের ডেলিভারিতে বেরিয়ে গেল। রাস্তা থেকে একটা টুংটুং ভেসে এল। তারপর আরেকটা।

এবার ঘণ্টিটা ও নিজেই বাজাচ্ছিল।

আমি এখনও নিজে নিজেই বাজি। চেষ্টা চলছে। -হু.

অসম্ভব ডেলিভারি · ৪

(খুব শিগগিরই)

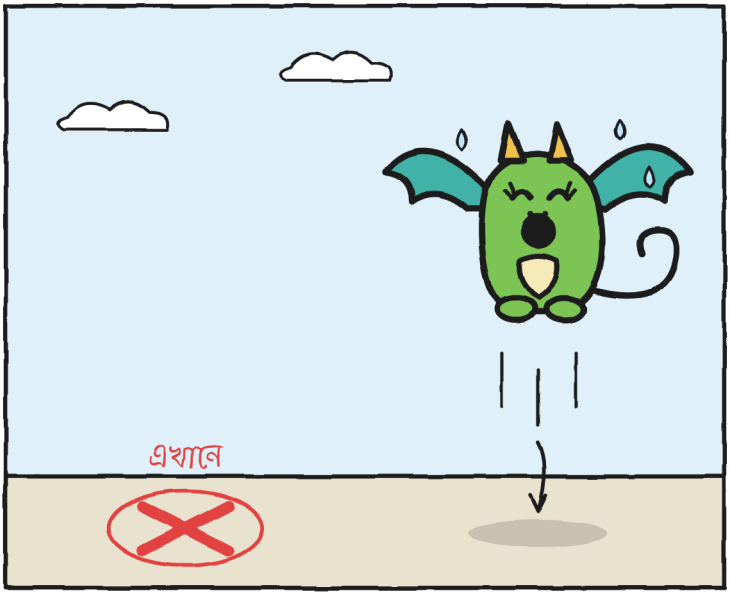

যে ড্রাগন-ছানা তোমাকে নকল করে, সে কোথায় নামে? -হু.

পাড়া (ভার্সন ৩)

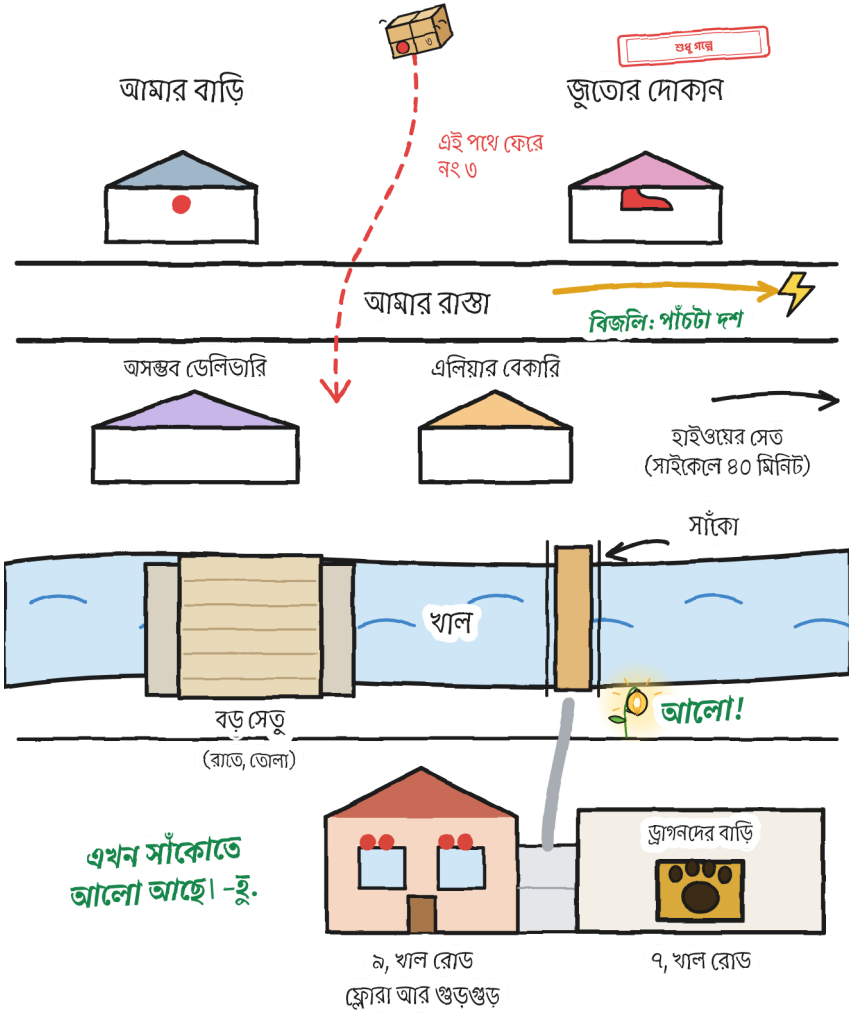
শুধু গল্পে
আমার বাড়ি
জুতোর দোকান
এই পথে ফেরে
নং ৩
আমার রাস্তা
বিজলি: পাঁচটা দশ
অসম্ভব ডেলিভারি
এলিয়ার বেকারি
হাইওয়ের সেত
(সাইকেলে ৪০ মিনিট)
সাঁকো
খাল
আলো!
বড় সেতু
(রাতে, তোলা)
এখন সাঁকোতে
আলো আছে। -হু.
ড্রাগনদের বাড়ি
৯, খাল রোড
ফ্লোরা আর গুড়গুড়
৭, খাল রোড

আর তুমি, তোমার নাম কী?

তোনিওকে সবাই তোনু বলে ডাকত। এখন সে নিজেই ঠিক করে, তার কী নাম হবে। আর তুমি?

আমাকে এই নামে ডাকা আমার ভালো লাগে...

_____

আমাকে এই নামেও ডাকা যায়...

_____

আমাকে এই নামে না ডাকলে ভালো হয়...

_____

_____

আমি হুলিতা। "হু." শুধু সই করার সময়। -হু.

অসম্ভব ডেলিভারি

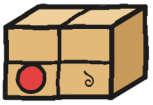

১ · এই পার্সেলটা কামড়ায়

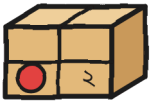

২ · মেঘ ডাকার আগে খুলবেন না

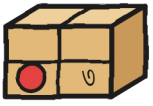

৩ · ফেরত পাঠান, প্লিজ

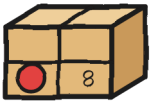

৪ · (খুব শিগগিরই)

বাকি সতেরোটা। -হু.

একটা গল্প, ছয় সাইজ

এই বইটা ছয়টা সাইজে আছে, ৩ থেকে ১৬ বছরের জন্য, আর ২০টিরও বেশি ভাষায়। XXS, XS, S, M আর L একই ছবি নিয়ে পাতায় পাতায় গল্পটা বলে, প্রতিবার আরও একটু সূক্ষ্মতা নিয়ে; XL হলো উপন্যাস: একই গল্প, যেখানে গুনি যা ভাবে অথচ বলে না, তার সবকিছুর জন্য জায়গা আছে।

CEFR অনুসারে স্তরগুলো আনুমানিক: XXS, pre-A1 · XS, A1 · S, A2 · M, B1 · L, B2 · XL, B2–C1।

যার যার সাইজে। টুংটাং একই। -হু.

পরিবার ও শিক্ষকদের জন্য

linguaula.com-এ প্রতিটা অধ্যায় নিয়ে কাজ করো (L সাইজের অ্যাক্টিভিটিসহ)

সত্যিকারের সাইকেল: কী করতে হবে

১. সবসময় হেলমেট পরো, আর ঠিকমতো আটকে নাও। “এই তো পাশেই” যাওয়ার সময়ও।

২. যাতে লোকে তোমাকে দেখতে আর শুনতে পায়: আলো, হালকা রঙের জামা আর বেল। বেল সতর্ক করে; হুকুম দেয় না।

৩. দুই হাতই হ্যান্ডেলে রাখো। কিছু তোমার মনোযোগ কেড়ে নিলে নিরাপদ জায়গায় থামো।

৪. ফুটপাত তার, যে হেঁটে চলে: সেখানে সাইকেল হাতে ধরে হাঁটো। রাস্তা পার হওয়ার আগে থামো আর দেখো।

“শুধু গল্পে” সিলমোহর বোঝায়, কী গল্পে ঘটে, আর রাস্তায় ঘটে না।

বেরোনোর আগে নিজের সাইকেলটা দেখে নাও

